হ্যান্ডবুক

রিপোর্টারের জন্য নীতি-নৈতিকতা

প্রসঙ্গ শিশু

রিপোর্টারের জন্য নীতি-নৈতিকতা
প্রসঙ্গ শিশু

MRDI

unicef

লেখক
কুররাতুল-আইন-তাহমিনা

© ইউনিসেফ বাংলাদেশ
নভেম্বর ২০১০

এই হ্যান্ডবুকটির কপি ইউনিসেফ বাংলাদেশের
ওয়েবসাইটে দেয়া আছে।
ডাউনলোড করার জন্য ভিজিট করুন:
www.unicef.org.bd

এই হ্যান্ডবুকটির সম্পূর্ণ কিংবা অংশবিশেষ
পুনর্মুদ্রণের জন্য অনুমতি লাগবে।
অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন:

ইউনিসেফ বাংলাদেশ
শেরাটন হোটেল এনেক্স বিল্ডিং
১, মিন্টো রোড, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।

টেলিফোন : ৮৮-০২-৯৩৩৬৭০১
ইমেইল : dhaka@unicef.org
ওয়েবসাইট : www.unicef.org.bd

আইএসবিএন : ৯৮৪-৭০২৯২-০০২৪-৭

ডিজাইন এবং লেআউট
ট্রান্সপারেন্ট

মুদ্রণ
এভারগ্রীন প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং

বিষয়সূচি

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ভূমিকা	১
১	নীতি-নৈতিকতা কেন জরুরি	২
২	নৈতিকতা মেনে সাংবাদিকতা এবং শিশু	৭
৩	সার্বিকভাবে নীতি-নৈতিকতা	১১
৪	শিশুর প্রেক্ষাপটে নীতি-নৈতিকতা	১৮
৫	বাংলাদেশে সাংবাদিকতা ও শিশু	৩৪
৬	দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সিদ্ধান্ত	৭৪
৭	নীতিমালা ও দায়বদ্ধতার খোঁজে	৮০
৮	পরিশিষ্ট	৮৪
	পরিশিষ্ট ১ তালিকা : শিশু বিষয়ে সম্ভাব্য প্রতিবেদনের ক্ষেত্র	৮৪
	পরিশিষ্ট ২ নৈতিকতার প্রশ্নে দ্বিধাদ্বন্দ্বের কিছু ক্ষেত্র	৮৭
	পরিশিষ্ট ৩ শিশুদের নিয়ে রিপোর্ট করার জন্য ইউনিসেফের দিকনির্দেশনা/নীতিমালা	৯৩
	পরিশিষ্ট ৪ তথ্যসূত্র ও ওয়েব-ঠিকানা	৯৫

ভূমিকা

শিশু-সংক্রান্ত ঘটনার রিপোর্টিংয়ে এবং শিশু পাঠকের কথা ভেবে নৈতিক সাংবাদিকতা নিশ্চিত করা লক্ষ্যে ২০০৯-২০১০ সালে ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ—এমআরডিআই একটি প্রকল্প হাতে নেয়। রিপোর্টারদের জন্য এই সহায়িকাটি প্রকাশিত হচ্ছে সে প্রকল্পের আওতায়।

নীতি-নৈতিকতার সার্বিক দিকনির্দেশনা ছাড়া রিপোর্টার শিশুর জন্য নৈতিক সাংবাদিকতা নিশ্চিত করতে পারবেন না। এ বইয়ে তাই শিশুর প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে দেখার পাশাপাশি সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতার সার্বিক মাত্রা সম্পর্কে কিছু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

এমআরডিআইয়ের প্রকল্পটি দেশজুড়ে সাংবাদিকদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। পুরো কাজের গতিপথ ঠিক করার জন্য এ প্রকল্প শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় শিশুকেন্দ্রিক বিষয়ে এবং শিশুর জন্য জরুরি বিবেচনাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে বিরাজমান নৈতিকতার পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি ভিত্তি-সমীক্ষা দিয়ে। সেই ভিত্তি-সমীক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মডিউল এ বইয়ের রূপরেখা ও বিষয়বস্তু ঠিক করে দিয়েছে।

ভিত্তি-সমীক্ষা ও প্রশিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত সবার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। এই বইটি লিখে কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন কুররাতুল-আইন-তাহমিনা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ্ আল ফারুক অনেক যত্ন নিয়ে বইটির শিশু অধিকার সনদ ও শিশুর জন্য প্রাসঙ্গিক জাতীয় আইনসংক্রান্ত অংশগুলো পড়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক কাজী এম এইচ সুপন প্রশিক্ষণ সেশনের জন্য যে তথ্যপত্র ব্যবহার করেছিলেন সেগুলোর কিছু তথ্য এ বইয়ে ব্যবহার করা হয়েছে। মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ল-এর পরিচালক অ্যাডভোকেট ড. শাহ্‌দীন মালিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের চেয়ারম্যান ড. সুমাইয়া খায়ের, আইন বিশেষজ্ঞ মো. মইনুল কবির এবং ব্যারিস্টার তানজিব-উল আলম। তাঁদের প্রত্যেককে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই।

এ প্রকল্পে সার্বিক সহায়তা করেছে জাতিসংঘ শিশু তহবিল—ইউনিসেফ। ইউনিসেফকে এবং প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত এমআরডিআইয়ের সব কর্মীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অধ্যায় ১

নীতি-নৈতিকতা কেন জরুরি

চিন্তাটা শুরু করা দরকার একেবারে গোড়া থেকে। নিজেকে প্রশ্ন করুন, কেন সাংবাদিকতা করছি? এটা কি আমার জন্য নিছক জীবিকার উপায়—কেবল একটি চাকরি? কাজটিতে নিত্য নতুনত্ব আছে, সত্য উদ্‌ঘাটনের চ্যালেঞ্জ বা উদ্দীপনা আছে—সেটা আমাকে আকর্ষণ করে? কাজটিতে সম্মান আছে, প্রভাব-প্রতিপত্তি মেলে, দশে মানে—সে দিকটি আমাকে টানে? সাংবাদিকতা মানুষের উপকার করতে পারে—কাজের সে মাত্রাটি আমাকে তৃপ্তি দেয়?

হয়তো এ সবগুলো তাগিদই মিলেমিশে আমাদের এ পেশায় টেনে আনে, ধরে রাখে। নীতি-নৈতিকতা না মেনে সাংবাদিকতা করলে কিন্তু কোনো তাগিদই সত্যিকার অর্থে মেটানো যায় না। সাংবাদিকতা তখন হয়ে পড়ে যান্ত্রিক, বিকাশরুদ্ধ, অর্থহীন, লক্ষ্যচ্যুত, মর্যাদাহীন এবং মানুষের জন্য ক্ষতিকর এক চর্চা।

নীতিনিষ্ঠতা সাংবাদিকের পেশাদারির দাবি; মানুষ ও সত্যের প্রতি তাঁর নৈতিক দায়িত্বের দাবি। নীতি-নৈতিকতা এ পেশাকে ভালোবাসার দাবি এবং তার ফসল, কেননা কাজটিকে ভালো না বাসলে ভালো সাংবাদিকতা করা যায় না।

এই বইয়ে আমরা শিশুকে নিয়ে এবং শিশুর জন্য নৈতিক সাংবাদিকতার দিকনির্দেশনা খুঁজছি। নীতি-নৈতিকতাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার সুযোগ নেই। সার্বিক নীতি-নৈতিকতার অনেকগুলো দিক শিশুর প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে জরুরি হয়। সেভাবেই আমরা ধাপে ধাপে বিষয়টি দেখব।

নীতি-নৈতিকতার দাবিকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয় সাংবাদিকের আচরণবিধি বা নৈতিকতার বিধিমালা। এ পেশার পথ চেনার জন্য এমন বিধিমালার সহায়তা প্রয়োজন হয়।

কারা কেন আচরণবিধি বা নৈতিকতার বিধিমালা করে

সাংবাদিকের নীতি-নৈতিকতার নির্দেশনা কিন্তু কোনো আইন নয়। এটা আইন হওয়া বাঞ্ছনীয়ও নয়। আইনি বাধ্যবাধকতা নৈতিক সাংবাদিকতা নিশ্চিত করতে পারে না।

আপনার কাজ, স্বাধীনভাবে সব রকম প্রভাবমুক্ত থেকে সত্য খোঁজা ও প্রকাশ করা। এমন সত্য, যা সমাজের মানুষের কল্যাণের স্বার্থে জানা ও জানানো জরুরি। সাংবাদিকতা জীবনের মতোই বিচিত্রমুখী। প্রতিটি নতুন পরিস্থিতি নিজের দাবি নিয়ে আসে। সাংবাদিককে সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হয়। নীতি-নৈতিকতা তাই উঠে আসতে হয় বিবেক ও দায়িত্ববোধের জমিন থেকে, স্বেচ্ছায়।

বিষয়টি হচ্ছে, সেলফ রেগুলেশন—নিজের কাজকে নিজে নীতিবিধির মধ্যে আনা।

নীতি-নৈতিকতার বিধিবিধান কেন মানবেন

— নিজ স্বার্থে। বড় একটি কারণ, দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে সত্য খোঁজা এবং প্রকাশের স্বাধীনতা ও সুযোগ রক্ষা করা। এভাবে নিজেদের কাজের ওপর বাইরের হস্তক্ষেপ, সরকারি বা ক্ষমতার বিধিনিষেধ বা চাপ ঠেকানো। আপনি যা কিছু করছেন, সেসব কাজকে—নিজের বিবেকের তাগিদকে—নৈতিক সমর্থন জোগানোর যুক্তি পাওয়া।

— মানুষের প্রতি দায়িত্বের জন্য। আপনার কাজ প্রতিনিয়ত মানুষের জীবনকে স্পর্শ করছে। আপনি তাই মানুষের কাছে দায়বদ্ধ। নীতি-নৈতিকতা মান্য করলে মানুষের আস্থা ও সমর্থন মেলে। সেটাই আপনার স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ।

— আপনার বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সঠিক ও ন্যায্য ভিত্তি পাওয়ার জন্য। আপনি কী রিপোর্ট করবেন, সে রিপোর্টে কী রাখবেন আর কী বাদ দেবেন, কার কোন কথা তুলে ধরবেন—সেসব আপনি প্রতিপদে বাছাই করে চলেন। নৈতিক মূল্যবোধ আপনাকে এ বাছাইয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

কারা আচরণবিধি বা নীতিমালা করে

নীতি-নৈতিকতা সাংবাদিকতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এটা আরও স্পষ্ট হয় যখন আমরা দেখি, কারা সাংবাদিকদের নৈতিকতার বিধিমালা বা আচরণবিধি প্রণয়ন করে। এমন বিধি তৈরি করে মূলত :

✓ সাংবাদিকদের পেশাজীবী সংগঠন—এটা হতে পারে সাংবাদিকদের ইউনিয়ন, মোর্চা, সমিতি, কোনো সংস্থা বা প্রেসক্লাব।

✓ সম্পাদকদের সংগঠন

✓ মালিকদের সংগঠন—কখনো মালিক ও সম্পাদকেরা একত্রে নিজেদের আচরণবিধি তৈরি করেন।

✓ সংবাদ প্রতিষ্ঠান বা মাধ্যম—দুনিয়াজুড়ে বড় বড় সংবাদপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নীতিমালা/আচরণবিধি অথবা লিখিত সম্পাদকীয় নীতিমালা আছে।

✓ প্রেস কাউন্সিল—যে প্রতিষ্ঠান সাংবাদিকতার চর্চা সম্পর্কে নাগরিকদের অভিযোগ শোনে ও বিচার করে। এভাবে এ প্রতিষ্ঠান নাগরিক ও সংবাদকর্মীদের মধ্যে সেতুবন্ধ হয়ে উঠতে পারে। কখনো প্রেস কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হতে পারে, যেমন হয়েছে বাংলাদেশে। (*দেখুন, অধ্যায় ৫-এর খ. অংশ এবং অধ্যায় ৭*)

কদাচিৎ সরকার বা সংসদ আইন বেঁধে সাংবাদিকতার নীতিমালা আরোপ করে। কখনো কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশেষ কোনো নীতিমালা প্রস্তাব করতে পারে। কদাচিৎ অন্য কোনো ক্ষমতাবান গোষ্ঠী কিছু বিধির পালন দাবি করতে পারে। তবে চাপিয়ে দেওয়া আচরণবিধি সাংবাদিকতার সঙ্গে খাপ খায় না।

বিশ্বের কয়েকটি পুরোনো এবং/অথবা উল্লেখযোগ্য আচরণবিধি বা নীতিমালার নিদর্শন যাদের কাছ থেকে পাওয়া যায় তাদের মধ্যে রয়েছে :

— **দ্য ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব জার্নালিস্টস**—এনইউজে, যেটায় যুক্তরাজ্য ও আয়ারল্যান্ডের সাংবাদিকদের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।

— **সোসাইটি অব প্রফেশনাল জার্নালিস্টস**—এসপিজে, যেটা যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিকদের প্রতিনিধিত্ব করে।

— **দি ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব জার্নালিস্টস**—আইএফজে, যেটায় পৃথিবীর ১০০টিরও বেশি দেশের সাংবাদিকদের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।

— **দ্য ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন**—বিবিসির সম্পাদকীয় নীতিমালা, যুক্তরাজ্য।

— **যুক্তরাজ্যের সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশনাশিল্পের আচরণবিধিটি** আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। সম্পাদকদের চর্চার নীতিমালা (এডিটরস কোড অব প্র্যাকটিস) নামে পরিচিত এ নীতিমালা তৈরি করেছেন খোদ সম্পাদকেরা। **এর প্রয়োগ নিশ্চিত করে দ্য প্রেস কমপ্লেইন্টস কমিশন—পিসিসি**। পিসিসি একটি স্বেচ্ছাব্রতী প্রতিষ্ঠান। এটি যুক্তরাজ্যের সংবাদপত্র ও সাময়িকীর সংবাদ/সম্পাদকীয় বিষয়বস্তু নিয়ে নাগরিকদের অভিযোগের মীমাংসা করে।

ওপরের তালিকাভুক্ত নীতিমালাগুলোয় শিশুদের প্রসঙ্গে আলাদা করে কথাবার্তা বলা হয়েছে। বিবিসির সম্পাদকীয় নীতিমালায় শিশুর বিষয়ে আলাদা একটি অধ্যায় রয়েছে। শিশু ও শিশুর জন্য জরুরি বিষয়গুলো রিপোর্ট করা সম্পর্কে আইএফজের রয়েছে বিশেষ নীতিমালা। এ ছাড়া, জাতিসংঘ শিশু তহবিল—ইউনিসেফ ও ইয়োরোপভিত্তিক এনজিওদের মোর্চা 'চিলড্রেন রাইটস ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক—ক্রিন এ বিষয়ে নীতিমালা (গাইডলাইনস) দিচ্ছে। এসব নীতিমালা/আচরণবিধি এবং রিপোর্টিংয়ের একটি পাঠ্যবই (মেনচির, ২০০৮) খুঁটিয়ে দেখে আমরা এ বইয়ে সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতার জরুরি দিকগুলো চিহ্নিত করেছি। (*দেখুন, অধ্যায় ৩ ও অধ্যায় ৪*)

ব্যক্তি-সাংবাদিকের থাকে নিজস্ব নৈতিকতা বোধ, যা তাঁকে সঠিক কাজটি করতে সাহায্য করে। বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক আচরণবিধি প্রণয়ন বা চর্চার রেওয়াজ প্রায় নেই বললেই চলে। হাতেগোনা কয়েকটি নীতিমালার কথা শোনা যায়। এ দেশে তাই সাংবাদিকের নিজস্ব নৈতিকতা আরও বেশি জরুরি হচ্ছে। সবার আগে সে নৈতিকতার ভিত্তিধারণা এবং মূল্যবোধগুলো একটু ভাবা দরকার।

খুব সহজ করে বলতে গেলে, মূল কথা হচ্ছে মানুষকে মনে রেখে কাজ করা। নিজের প্রিয়জনের কল্যাণ এবং সত্যের প্রতি আনুগত্য—দুটোকে একসঙ্গে মনে রাখলে নৈতিক অবস্থান খুঁজে পাওয়া সহজ হয়।

সাংবাদিকের স্বাধীনতা, সুযোগ ও দায়িত্ব : কেন্দ্রে মানুষ

সাংবাদিকের কাজ মানুষের জীবনের জন্য জরুরি। ভালোভাবে জীবন চালানোর জন্য মানুষের তথ্য ও মতামত জানা-বোঝা এবং জানানো-বোঝানো প্রয়োজন হয়। সাংবাদিকতা মানে, মানুষকে এই তথ্যসেবা দেওয়া।

— চারপাশে কী ঘটছে, ঘটতে যাচ্ছে, মানুষের জীবনকে তা কীভাবে প্রভাবিত করবে—মানুষকে প্রতিনিয়ত তা জানতে এবং বুঝতে হয়। না হলে নিজের ব্যক্তিজীবন ও সম্মিলিত সমাজের জীবনের জন্য জরুরি বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয় না।

— মানুষ বিচিত্র জগৎ সম্পর্কে, সে জগতের পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে চায়—তার কৌতূহল মেটে; জীবন ও জগতের সম্ভাবনাগুলো সে বুঝতে পারে।

— গণতন্ত্রের চর্চা ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি নির্ভর করে সর্বসাধারণের তথ্য পাওয়া এবং জানানোর অধিকারের ওপর; মানুষের ভালো থাকার জন্য জরুরি বিষয়গুলোতে সমাজের সব অংশের মধ্যে সচেতনতা, আলোচনা-বিতর্ক, তথ্যের আদান-প্রদান, জনমত গঠন ও সেটা প্রকাশের সুযোগের ওপর। এই প্রক্রিয়ায় সাংবাদিকতা মুখ্য ভূমিকা নিতে পারে।

মানুষের এ চাহিদা ও প্রয়োজনগুলো মেটানোর অলিখিত প্রতিশ্রুতির জোরেই কিন্তু সাংবাদিক নিজের কাজে স্বাধীনতার অধিকারী হন, সত্য খোঁজার বিশেষ সুযোগ ও অধিকার দাবি করতে পারেন। সাংবাদিকের খুঁটির জোর নিহিত রয়েছে এই দায়িত্ব পালন করার মধ্যে। অন্যদিকে এ অধিকারের জোরে সাংবাদিক যখন কাজ করেন, তিনি বহু মানুষের জীবনকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেন। সাংবাদিককে এর দায়দায়িত্ব নিতে হয়।

সুতরাং সাংবাদিকের নৈতিকতার কেন্দ্রে আছে মানুষ এবং মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ। সাংবাদিকের কাজ মানুষকে নিয়ে, মানুষের জন্য। রোজকার কাজ এবং সার্বিকভাবে তাঁর পেশাগত অধিকার ও দায়িত্বের ভিত্তিও এখানেই।

একেবারে গোড়ার মূল্যবোধ

— জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা; জীবনের সব অধিকার, মর্যাদা ও সম্ভাবনার প্রতি অঙ্গীকার।

— মানুষ—ব্যক্তি, গোষ্ঠী, পুরো জনসমাজ—সবার ন্যায্য কল্যাণের লক্ষ্যে সত্য খোঁজা ও প্রকাশ করা।

— এ দায়িত্ব পালনে কারও প্রতি বৈষম্য না করা; সবার প্রতি ন্যায্য থাকা।

সাংবাদিকতার নৈতিক দায়িত্বের দুটি দিক

— মানুষের ভালো থাকার জন্য যা তাদের জানা-বোঝা দরকার, জানানো দরকার—সেসব ঘটনা ও বিষয়গুলোর সত্য খোঁজা এবং যথাযথ তুলে ধরা; সেগুলো মানুষের আলোচনা-বিতর্কে নিয়ে আসা; এভাবে মানুষের সমৃদ্ধ জীবন পাওয়ায় সহায়তা করা। এটাই জনস্বার্থে বা সম্মিলিত জনজীবনের সাধারণ স্বার্থে সাংবাদিকতা করা। সাধারণ স্বার্থ দেখতে গিয়ে

ন্যায্যতা ও পরিচ্ছন্ন বিবেকের নির্দেশ মেনে চলতে হয়। সাধারণ স্বার্থের আওতায় আছে ব্যক্তিস্বার্থ, যতক্ষণ তা অন্যের জন্য ক্ষতিকর না হয়।

বলা হয় যে, সাংবাদিক মানুষের সাধারণ স্বার্থের সংরক্ষণে নজরদারি করবেন বা 'ওয়াচডগ'-এর দায়িত্ব পালন করবেন। এজন্য একটি প্রধান কাজ হচ্ছে সরকার ও ক্ষমতার জবাবদিহি নিশ্চিত করা।

— কারও অন্যায্য ক্ষতি না করা এবং কারও ওপর অযাচিত বিরূপ প্রভাব না ফেলা।

এ দায়িত্বের তিনটি মাত্রা

১. সংবাদের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের প্রতি দায়িত্ব; তাদের প্রতি ন্যায্য হওয়া।

২. সত্য, পেশার দাবি ও নিজের বিবেকের প্রতি দায়িত্ব।

৩. সর্বসাধারণ ও পাঠকের প্রতি দায়িত্ব ও ন্যায্যতা।

নৈতিক সাংবাদিকতা এ তিনটি মাত্রার মধ্যে ন্যায্য সমন্বয় ও ভারসাম্য করতে চেষ্টা করে।

শিশুরা জনসমাজের একটি বিশেষ অংশ, খুব জরুরি অংশ। শিশুর প্রতি সাংবাদিকতার বিশেষ দায়িত্বের মাত্রাগুলো আলাদা করে বোঝার দরকার আছে। তবে তার আগে এই বই সম্পর্কে আরেকটি ছোট কথা আছে :

রিপোর্টার এবং সম্পাদনাকারী একযোগে—এ বই রিপোর্টারদের জন্য। কিন্তু এমআরডিআই বাংলাদেশে শিশুকেন্দ্রিক সাংবাদিকতায় নীতি-নৈতিকতা বিষয়ে যে সমীক্ষা এবং তার ভিত্তিতে দেশজুড়ে সাংবাদিকদের মধ্যে যে প্রশিক্ষণ ও পরিচিতিমূলক আলোচনা অনুষ্ঠিত করেছে, সেগুলোর অভিজ্ঞতা বলছে একা রিপোর্টার নৈতিক সাংবাদিকতা নিশ্চিত করতে পারবেন না। (এমআরডিআই/ইউনিসেফ, ২০০৯)

সম্পাদনা এবং নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে যাঁরা আছেন, তাঁদের ভূমিকা সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরাই রিপোর্টারকে খবর করতে পাঠান, খবর বাছেন বা বাদ দেন, রিপোর্ট সম্পাদনা করেন এবং রিপোর্টের শিরোনাম দেন ও মূল্যায়ন (ট্রিটমেন্ট) করেন। এ বই সুতরাং সংবাদের সিদ্ধান্তগ্রহীতা বা গেটকিপারেরাও কাজে লাগাবেন—এটা প্রত্যাশা।

অধ্যায় ২

নৈতিকতা মেনে সাংবাদিকতা এবং শিশু

সাংবাদিকের দায়িত্ব রয়েছে আজকের এবং আগামী দিনের জনসমাজের কল্যাণের প্রতি।

সাংবাদিকতার অন্তর্নিহিত নৈতিকতা আলোচনা করতে গিয়ে একটি পাঠ্যবই বলছে, রিপোর্টার প্রতিদিন তাঁর কাজের মধ্যে তাৎক্ষণিক বর্তমান ও অতীতকে তুলে ধরেন এবং একই সঙ্গে সম্ভাব্য ভবিষ্যতের চিত্র দেন। মানুষের সম্মিলিত জীবনের বিকাশের প্রক্রিয়ায় এভাবে সাংবাদিক একটি মুখ্য ভূমিকা রাখেন। (মেনচির, ২০০৮)

এভাবে চিন্তা করলে শিশুরা আপনার রোজকার কাজে অনেক বড় বিবেচনার দাবিদার হয়ে আসে। শিশুর কল্যাণের জন্য সাংবাদিকতা মানে চির-ভবিষ্যতের স্বার্থে কাজ করা। সাংবাদিকতা কিন্তু প্রায়ই এ দাবি উপেক্ষা করে—সংবাদ করার সময় শিশুদের কথা গুরুত্ব দিয়ে মনে রাখা হয় না। সংবাদকে দেখা হয় মূলত বড়দের ব্যাপার হিসেবে।

এমনটা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। এটা নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারার শামিল। শিশুরা জনসমাজের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। ভবিষ্যতের সুস্থ জনসমাজের স্বার্থেও আপনার কাজে শিশুর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের প্রতি মনোযোগী হওয়া বিশেষ জরুরি হবে। অন্যদিকে, শিশুরা কিন্তু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাংবাদিকতার ফল ভোগ করে। আপনি সজাগ না থাকলে এটা তাদের জন্য দুর্ভোগ বয়ে আনতে পারে।

শিশুরা তিনভাবে সাংবাদিকতার সংস্পর্শে আসে এবং তিনটি মাত্রাতেই সাংবাদিকের সজাগ ভূমিকা রাখার নৈতিক দায়িত্ব আছে :

১. শিশু যখন নিজে ঘটনায় জড়িত থাকে তখন সাংবাদিক কীভাবে তাকে এবং তার স্বার্থ দেখেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়। সেটার ওপরে ওই শিশুর কল্যাণ-অকল্যাণ সরাসরি নির্ভর করে। আবার, শিশুকে যেভাবে তুলে ধরা হয় তা সার্বিকভাবে শিশু সম্পর্কে সংবাদের গ্রাহকদের অর্থাৎ শিশুর জীবন-নিয়ন্ত্রক বড়দের দৃষ্টিভঙ্গি ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। একই রকম গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শিশুর জন্য জরুরি বিষয়গুলো যথাযথভাবে সমাজের নজরে আনার প্রশ্ন। সংবাদমাধ্যম কীভাবে এ বিষয়গুলো তুলে ধরছে অথবা উপেক্ষা করছে, তার প্রভাবও গভীর হয়।

২. অন্যদিকে শিশুরা কিন্তু নিয়মিত পত্রিকার খবর পড়ে, ছবি দেখে। তারা টিভির খবর দেখে। আজকাল অনলাইনও অনেক শিশুর আয়ত্তে। সংবাদ যেহেতু সচরাচর বড়

পাঠকদের মাথায় রেখে তৈরি করা হয়, সেখানে এমন অনেককিছু থাকতে পারে যা শিশুর ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। জীবনের উন্মেষপর্বে অনেককিছুই শিশুর মনে চট করে গভীর ছাপ ফেলতে পারে। শিশুর বৃদ্ধি-বিকাশের গুরুতর ক্ষতি না করার কথা সব সময় মনে রাখা জরুরি। এই নাজুক অবস্থানের পাশাপাশি আছে শিশুর প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়ার, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে জানার অধিকার। সংবাদের যে অংশই শিশুর নজরে পড়তে পারে সেখানে দুই দিকে ভারসাম্য করে খবর জানানোর কাজটি সহজ নয়। বিশেষ যত্ন চাই।

৩. ব্যক্তি হিসেবে শিশুর কথা বলার বা মত দেওয়ার অধিকার আছে। তার জন্য জরুরি বিষয়ের খবরে তাকে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া চাই। সমীক্ষা দেখেছে, যেসব ঘটনা বা বিষয়ে শিশু ও তার স্বার্থ সরাসরি জড়িত, সেগুলোর খবরেও তাদের মতামত উপেক্ষিত হচ্ছে বা গুরুত্ব পাচ্ছে না (এমআরডিআই/ইউনিসেফ, ২০০৯)। জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা নীতি-সিদ্ধান্ত-মতগঠনের প্রক্রিয়ায় শিশুর কণ্ঠস্বর অনুপস্থিত বললেই চলে। এই প্রক্রিয়াগুলোর সহায়ক দায়িত্ব পালন করার সময় সাংবাদিকও শিশুর প্রাসঙ্গিক বক্তব্য-মতামত খুঁজতে ভুলে যান। শিশুকে সংবাদে উপস্থিত করতে গেলে তার সুরক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন তো বটে, কিন্তু পাশাপাশি তার মতপ্রকাশের অধিকার সমুন্নত রাখার উপায় ভাবা নৈতিকতারই দাবি।

শিশু ও সাংবাদিকতার সম্পর্কের এই তিনটি মাত্রাতেই বাংলাদেশের সাংবাদিকদের আরও নীতি-নৈতিকতা মেনে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। শিশুর নাজুক অবস্থান বিবেচনায় রাখা এবং একই সঙ্গে তাকে পূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা—এই আপাত-বিপরীতমুখী চাহিদা মেটানোর জন্য বাড়তি চেষ্টা ও যত্ন চাই।

শিশুর সর্বোচ্চ কল্যাণ ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আপনাকে মোটা দাগে দুটি দিকে বিশেষভাবে মনোযোগী হতে হবে :

— **যেসব ঘটনা, প্রবণতা বা বিষয়ে শিশুরা জড়িত আছে সেগুলো এবং তাদের কল্যাণের জন্য জরুরি বিষয়গুলো জনসমক্ষে তুলে ধরা**—শিশুর তথ্য পাওয়া এবং মতপ্রকাশের অধিকারসহ তার সব অধিকার ও অধিকারবঞ্চনার বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে। শিশুর কল্যাণ সবার আগে।

— **প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে শিশুদের কোনো অনিষ্ট না করা**—শিশু ও তার ভালো থাকাকে গুরুতর ঝুঁকিতে ফেলার মতো কোনোকিছু যেন আপনার পরিবেশিত কোনো খবরে না থাকে সেদিকে নজর রাখতে হবে। সংবাদের ঘটনায় শিশু জড়িত থাকলে তার কোনো ক্ষতি করা যাবে না।

শিশুর প্রেক্ষাপটে নীতি-নৈতিকতার বিশেষ ক্ষেত্রগুলো চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত দেখা হবে। এই পর্যায়ে পরিষ্কার করা দরকার, শিশু কে—কোন বয়সীরা শিশু হিসেবে বিবেচিত হবে।

শিশু কে?

এ প্রশ্নটি মীমাংসার জন্য দেখা যাক, আইন কী বলছে।

— জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ একটি আন্তর্জাতিক আইন, যেটি বাংলাদেশ অনুমোদন করেছে একেবারে এর সূচনালগ্নে। সংক্ষেপে ইউএনসিআরসি বা সিআরসি নামে পরিচিত এ সনদ অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সী সকলেই শিশু। সনদ অনুমোদনকারী দেশের আইনে এর চেয়ে কম বয়সে সাবালকত্ব নির্ধারিত থাকলে তার জন্য কিছু নির্দেশনা আছে, সেটা পঞ্চম অধ্যায়ে দেখা হবে।

— এ দেশের বেশকিছু আইনে শিশুর বিভিন্ন বয়সসীমা নির্ধারিত আছে। প্রসঙ্গভেদে এমন বিভিন্ন বয়সসীমা অন্যান্য দেশেও প্রচলিত আছে।

বাংলাদেশের আইনে শিশুর বয়সসীমা

বিভিন্ন বিষয়ে রিপোর্ট করতে গিয়ে নিচে বলা আইনগুলোর বয়সসংক্রান্ত বিধান জানা আপনার জন্য জরুরি হবে।

— **সাবালকত্ব আইন ১৮৭৫ (মেজরিটি অ্যাক্ট) :** সিআরসির মতোই এ আইন বলছে যে, ১৮ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তি নাবালক হিসেবে গণ্য হবে। সে আইনত কোনো চুক্তির পক্ষ হতে পারবে না।

— **শিশু আইন, ১৯৭৪ এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) :** প্রথম আইনটি শিশুবিষয়ে দেশের প্রধান আইন। এ আইন শিশুর সর্বোচ্চ কল্যাণ বিধানে রাষ্ট্রের দায়িত্বের স্বীকৃতি। এটি আইনপরিপন্থী কাজে জড়িয়ে পড়া শিশুসহ কঠিন পরিস্থিতিতে থাকা শিশুদের সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রণীত। দ্বিতীয় আইনটি অনেকগুলো গুরুতর নির্যাতনের বিচারের জন্য করা। শিশু এ আইনের আওতায় আসে মূলত নির্যাতনের শিকার বা ভিকটিম হিসেবে।

দুটি আইনই বলছে, ১৬ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তি শিশু বলে বিবেচিত হবে। এ দুটি আইন তাদের আওতায় আসা শিশুদের নিয়ে করা সংবাদে শিশুর পরিচয় গোপন রাখার নির্দেশ দিচ্ছে।

— **দণ্ডবিধি, ১৮৬০ :** এর ৮২ নম্বর ধারায় অপরাধের দায়িত্ব আরোপের বয়স সম্পর্কে বিধিবিধান আছে। এ ধারা বলছে, নয় বছরের কম বয়সী শিশুর ওপর কোনো অপরাধের দায়িত্ব বর্তাবে না। নয় থেকে ১২ বছর বয়স অব্দি এ দায় আরোপ করা যাবে বিচারকের বিবেচনার শর্ত সাপেক্ষে। বয়স ১২ হয়ে গেলে কারও ওপর এ দায়িত্ব নিঃশর্তভাবে আরোপ করা যাবে। তবে অনূর্ধ্ব-১৬ বছর বয়সীর বিচার হবে শিশু আইনের বিধানগুলো অনুযায়ী, অর্থাৎ তার সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করে।

— **শ্রম আইন, ২০০৬ :** এ আইন ১৪ বছরের কম বয়সীদের 'শিশু' বলছে। আবার, ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়স পূর্ণ না হওয়া অব্দি ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হচ্ছে 'কিশোর' হিসেবে। আইনটি

বলছে, ১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের কোনো শ্রমে নিয়োজিত করা যাবে না। বারো বছর বয়স থেকে শিশুরা কিছু শর্ত সাপেক্ষে হালকা কাজে নিয়োজিত হতে পারবে। কিশোরেরা কিছু শর্ত সাপেক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ নয়, এমন শ্রমে নিযুক্ত হতে পারবে।

— **বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯ :** পুরুষেরা ২১ বছর এবং নারীরা ১৮ বছর বয়সের আগে বিয়ে করতে পারবে না। এর চেয়ে কম বয়সীরা বিয়ের জন্য নাবালক হিসেবে গণ্য হবে।

— **অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ১৮৯০ :** বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের মতোই এ আইনে পুরুষ প্রাপ্তবয়স্ক বিবেচিত হবে ২১ বছর বয়স পূর্ণ হলে আর নারী সাবালক হবে ১৮ বছর পূর্তিতে। অভিভাবকত্ব, সন্তানের দেখভালের দায়িত্ব এবং উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে শিশুর বয়স নির্ধারণ প্রাসঙ্গিক হয়। এ আইনটি ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মানুসারী পারিবারিক আইনগুলো নিয়ামক হবে।

সাংবাদিকের বিবেচনায় শিশু

অনেকে মনে করেন, শিশু অধিকার সনদ মান্য করে ১৮ বছরের কম বয়সী ব্যক্তিকে শিশু বিবেচনা করতে হবে।[১] একই সঙ্গে এত রকমের বয়স বিভ্রান্তিকরও বটে। তবে অনেকে আবার বলেন, বাস্তবতা ও বিষয় অনুযায়ী কিছু ক্ষেত্রে ভিন্ন বয়সসীমা যুক্তিযুক্ত। (*বিস্তারিত দেখুন, অধ্যায় ৫-এর খ, অংশে 'প্রসঙ্গ শিশুর বয়স'*)

বিষয়টি এভাবে ভাবা যেতে পারে :

— শিশু অধিকার সনদ ও সাবালকত্ব আইনের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী সাধারণভাবে ১৮ বছর বয়সকে শিশুকালের সীমা গণ্য করা দরকার। সংবাদের প্রভাব নিয়ে ভাবনাচিন্তার সময় এবং শিশুর বিভিন্ন অধিকারের প্রেক্ষাপটে অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বয়সীদের শিশু হিসেবে বিবেচনা করুন।

— তবে ওপরে বলা দেশের আইনগুলো যেসব ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হবে সেসব বিষয়ে আপনাকে আইনে নির্দিষ্ট বয়সসীমা আমলে নিয়ে সংবাদ করতে হতে পারে। পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা এসব আইন ও সাংবাদিকের জন্য এগুলোর প্রাসঙ্গিকতার কয়েকটি মাত্রা দেখব। সাংবাদিকের জন্য শিশুর বয়স নির্ধারণ তথা জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪-এর গুরুত্বও তখন দেখব।

[১] এই বই প্রকাশের সময় সরকার জাতীয় শিশুনীতি ২০১০ ও শিশু আইন ২০১০ এর খসড়া করেছে। সেখানে অনূর্ধ্ব-১৮ বছর বয়সীদের শিশু বলা হয়েছে।

অধ্যায় ৩

সার্বিকভাবে নীতি-নৈতিকতা

নীতি-নৈতিকতা মেনে সাংবাদিকতা করা মানে সমাজের মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে সাংবাদিকতা করা। যেমনটা প্রথম অধ্যায়েই স্পষ্ট হয়ে গেছে, এ দায়িত্ব পূরণ করতে হলে আপনাকে :

- ✓ কিছু কাজ করতে হবে—উপেক্ষা করা চলবে না।
- ✓ যে কাজ করছেন, সেখানে কিছু বিষয় নিশ্চিত করতে হবে এবং কিছু চর্চা এড়িয়ে চলতে হবে।

সত্যনিষ্ঠতা থেকে শুরু করে যে বিষয়গুলো প্রতিবেদনে নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক হয়, সেগুলো সাংবাদিকের নৈতিকতারও অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেই সঙ্গে আসে সংবাদে জড়িত মানুষজন, সর্বসাধারণ এবং পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের প্রতি দায়িত্বের বিবেচনা। এভাবে পেশাদারির সঙ্গে বিচার-বিবেচনা, সুরুচি ও বিবেকের দাবি এবং মানবিকতা ও দায়বদ্ধতার সমন্বয় করে সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা রূপরেখা পায়।

নীতি-নৈতিকতাকে টুকরো টুকরো খোপে ফেলে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা বাঞ্ছনীয় নয়। আগে নীতি-নৈতিকতার সাধারণ দাবিগুলো বোঝা দরকার। তা হলে শিল্পর প্রেক্ষাপটে জরুরি বিষয়গুলো ভালোভাবে বোঝা যাবে। মূল কথাগুলো কিন্তু আমরা সবাই জানি। প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কতটা সজাগ?

সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা বা সাংবাদিকের আচরণের বিভিন্ন বিধি ঘাঁটলে দেখা যায়, মৌলিক বিষয়ে বা মূলনীতিতে খুব কমই পার্থক্য রয়েছে। প্রয়োজনীয় সব দিক মিলিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা করা যাক। লক্ষ করবেন, এর অনেকগুলোই পরস্পর-সম্পর্কিত।

— সত্য অনুসন্ধান ও তুলে ধরা

- ✓ সঠিক ও সত্য তথ্য চাই। ভালোভাবে যাচাই করুন। প্রমাণ ও উদাহরণ দিন। সূত্রের গোপনীয়তা রক্ষা করাসহ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া পাঠক-শ্রোতা-দর্শককে অকপটে তথ্যের সূত্র বা উৎস জানান।
- ✓ অসত্য বলবেন না; সত্যের জরুরি অংশ চাপা দেবেন না; সত্য বিকৃত করবেন না। পূর্ণাঙ্গ চিত্র দিন।
- ✓ মানুষের যা জানা দরকার তা জানানোয় সাহসী হবেন; কুণ্ঠিত হবেন না। নিজের বা অন্য কারও দ্বারা প্রভাবিত হবেন না; সত্যনিষ্ঠতায় অবিচল ও সৎ থাকুন।

— **জরুরি ঘটনা বা বিষয় তুলে ধরা**

✓ মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা বিষয় তুলে ধরতে উদ্যোগী হবেন; কেবল চমকপ্রদ, চটকদার, চিত্তাকর্ষক, নজরকাড়া ঘটনা বা বিষয়ে মনোযোগী হবেন না। অর্থাৎ মানুষের যথার্থ প্রয়োজন ও যুক্তিসংগত আগ্রহ বুঝে ঘটনা বা বিষয়ের প্রকৃত সংবাদমূল্য বিচার করতে হবে।

✓ রিপোর্টে ভাসা ভাসা বিবরণ দেবেন না। ঘটনা বা বিষয় যথাযথ প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করবেন; তথ্য-প্রমাণের সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট করবেন; প্রয়োজনীয় সব দিকে নজর দেবেন; বিষয়ের যথাযোগ্য ও যথাসাধ্য গভীরে যাবেন; কারণ ও তাৎপর্য খুঁজবেন।

✓ ঘটনার দায়িত্ব চিহ্নিত করবেন। দায়ীজনের জবাবদিহি নিশ্চিত করবেন।

✓ বিবরণ হবে বাহুল্যবর্জিত সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ।

✓ প্রয়োজন বুঝে লেগে থেকে ঘটনা বা বিষয় অনুসরণ করবেন; একবার রিপোর্ট করে থেমে যাবেন না।

— **পক্ষপাতশূন্যতা ও ন্যায্যতা**

✓ কোনো ঘটনায় অত্যাবশ্যকভাবে জড়িত সবগুলো পক্ষের বক্তব্য বা দিক তুলে ধরবেন।

✓ কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উঠলে তার বক্তব্য চাই।

✓ পক্ষপাতশূন্যতা হবে যথাযোগ্য—ন্যায্য, বাস্তবে যার যতটা দাবি তা মিটিয়ে। ন্যায্য ভারসাম্য নিশ্চিত করে ঘটনার সব দিক/বিষয় সম্পর্কে বিদ্যমান সবগুলো মতামত তুলে ধরবেন।

✓ বিতর্কিত বিষয়ে যথাযথ পক্ষপাতশূন্যতা নিশ্চিত করতে বিশেষভাবে যত্নবান থাকবেন। প্রাসঙ্গিক ও জরুরি কোনো মতামত/তথ্য অপ্রিয় বা একাকী হলেও তুলে ধরবেন।

— **সংবাদ ও তথ্যের পবিত্রতা**

✓ ধারণা-অনুমান, মন্তব্য-মতামত, প্রচার-প্রচারণা বা বিজ্ঞাপনী প্রয়াস থেকে সংবাদ ও তথ্যকে পৃথক রাখবেন; কোনো ভুল বোঝার অবকাশ যেন না থাকে।

— **সততা**

✓ সৎ, অকপট ও খোলাখুলি উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করবেন; ঘটনায় জড়িত মানুষজনসহ তথ্যদাতা যেকোনো সূত্রের সঙ্গে অকপট হবেন; নিজের পরিচয় ও উদ্দেশ্য খুলে বলে তথ্য চাইবেন।

✓ মোটামুটি সুনিশ্চিত কোনো অন্যায়-অপরাধের তথ্য-প্রমাণ অনুসন্ধানে অপরিহার্য না হলে এদের সঙ্গে কোনো কপটতা করবেন না।

✓ অপরিহার্য না হলে টাকার বদলে তথ্য সংগ্রহ করবেন না। (অপরিহার্য পরিস্থিতি বলতে বোঝায়—কোনো তথ্য জনস্বার্থে জানা ও জানানো একান্ত জরুরি, কিন্তু সোজাপথে কিছুতেই তা পাওয়া যাচ্ছে না।)

✓ শ্রোতা-দর্শক-পাঠকের সঙ্গে কোনো প্রবঞ্চনা করবেন না। সত্য সম্পর্কে কোনো রকম বিভ্রান্তি বা ধোঁকা তৈরি করবেন না। সূত্রের আস্থা বা সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা অথবা আইনি কোনো বাধা না থাকলে তাদের সরাসরি জানাবেন যে, কার কাছ থেকে কী উপায়ে তথ্য পেয়েছেন।

✓ সহকর্মীদের প্রতি সৎ থাকবেন। অন্যের লেখা বা ধারণা চুরি করবেন না।

— সূত্রের নিরাপত্তা, আস্থা ও গোপনীয়তা

✓ প্রতিবেদনে তথ্যসূত্র উল্লেখ করা অত্যাবশ্যক। তবে তথ্যদাতার নিরাপত্তা, অযাচিত ঝুঁকি ও তাঁকে দেওয়া গোপনীয়তার শর্ত জরুরি বিবেচ্য বিষয়।

✓ তেমন ক্ষেত্রে তথ্যদাতাকে ঝুঁকিতে না ফেলে বা কাউকে দেওয়া গোপনীয়তার শর্ত ক্ষুণ্ন না করে প্রতিবেদনে তথ্যের উৎস যথাসম্ভব সুনির্দিষ্ট করার বিকল্প উপায় খুঁজতে হবে।

✓ কখনো সূত্রের নাম-পরিচয় গোপন করতে হতে পারে, কখনো সূত্র তথ্য প্রকাশ না করার শর্ত দিতে পারেন। গোপনীয়তার শর্তে তথ্য নিতে এবং সে তথ্য প্রতিবেদনে ব্যবহার করতে খুব সাবধান থাকবেন। তথ্যের গুরুত্ব ও নির্ভরযোগ্যতা বিচার করা অত্যাবশ্যক হবে।

✓ গোপনীয়তার শর্ত মেনে কারও কাছ থেকে কোনো তথ্য নিলে সে শর্ত অতি-অবশ্যই রক্ষা করবেন।

— সংবাদ করার ক্ষেত্রে ন্যায্যতা

✓ সমাজ বা জনগোষ্ঠীর সবগুলো অংশের প্রয়োজন ও আগ্রহ মিটিয়ে খবর করবেন। সংবাদে সবার ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করবেন—গণতান্ত্রিক মনোযোগ আকর্ষণের প্রক্রিয়ায় সবাই যেন যথাযোগ্য সুযোগ পায়, শামিল হতে পারে।

✓ দুটি জরুরি বিবেচনা আছে—

- প্রথমত, সমাজের কোনো অংশ যেন উপেক্ষিত না হয়;
- দ্বিতীয়ত, সমাজের বিভিন্ন অংশের নানামাত্রিক ভূমিকা ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো যেন বাস্তবানুগভাবে সংবাদে প্রতিফলিত হয়।

সাংবাদিক বিশেষভাবে সজাগ না থাকলে সমাজের অনেক অংশ সংবাদে নানাভাবেই উপেক্ষিত হতে পারে।

— **বঞ্চিতজনের প্রতি ন্যায্যতা**

✓ সমাজের যে অংশ বা যে সদস্যরা অধিক বঞ্চিত, যারা বেশি সমস্যায় জীবনযাপন করছে, তারা সাংবাদিকের মনোযোগ বেশি দাবি করে।

✓ দরিদ্র জনগোষ্ঠী, সমাজের দুর্বল অংশ, যাদের নিজেদের কথা তুলে ধরার মতো জোর নেই, যারা অন্যায়-অবিচার বা বঞ্চনার শিকার—নৈতিক কারণেই আপনি তাদের কল্যাণের বিষয়ে বাড়তি নজর রাখবেন। এটা সাংবাদিকের নৈতিকতার বিশেষ দাবি। এটা ন্যায্যতার দাবি।

— **বৈষম্য বা ছাঁচে ঢালা প্রতিফলন**

✓ জাতি, নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি, বর্ণ, লিঙ্গ, বয়স, ধর্ম ও বিশ্বাস, আর্থসামাজিক অবস্থা, শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতা, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, ভৌগোলিক অবস্থান, যৌনাচরণ—কোনো মাপকাঠিতেই কারও প্রতি বৈষম্য করবেন না অথবা প্রতিবেদনে বৈষম্যমূলক প্রতিফলন করবেন না।

✓ বাস্তবে যদি বৈষম্য থাকে, প্রতিবেদনে সেটা অবশ্যই তুলে ধরবেন। কিন্তু নিজে বৈষম্য করবেন না।

✓ প্রতিবেদনে ঢালাও সাধারণীকরণ বা ছাঁচে-ঢালা ধারণার প্রকাশ (জেনারালাইজড ও স্টিরিওটাইপড) না ঘটাতে বিশেষভাবে সতর্ক থাকুন।

— **জনস্বার্থের নজরদারি ও অন্যায়-অনিয়মের উদ্‌ঘাটন**

✓ সর্বসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণে নজরদারি বা ওয়াচডগ ভূমিকার তাগিদ থেকে আপনি—

- অপরাধ, আর্থিক বা অন্যান্য দুর্নীতি, গুরুতর সমাজবিরোধী আচরণ-কাজকর্ম, সব রকম অনিয়ম-অবিচার, অন্যায়, দায়িত্বপালনে গুরুতর ব্যর্থতা বা অদক্ষতা, আগ্রাসী লোভ—এসব ঘটনা ও প্রবণতা উন্মোচন করবেন।
- কেউ কথায় বা কাজে মানুষকে প্রতারিত করলে সেটা উন্মোচন করতে আপনি ব্রতী থাকবেন।
- জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার (পাবলিক হেল্থ ও সেফটি) সংরক্ষণ আপনার নজরদারির আওতায় পড়বে।
- সরকারের ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, গণপ্রতিষ্ঠান অথবা জনদায়িত্বপ্রাপ্ত যেকোনো ক্ষমতার ওপর নজর রাখা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হবে।
- গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনসাধারণকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে, এমন যেকোনো তথ্য প্রকাশ করা আপনার নৈতিক দায়িত্ব। (এনইউজে, পিসিসি, বিবিসি)

— জনসাধারণ বনাম ব্যক্তির অধিকার ও ব্যক্তিগত জীবনযাপনের সুরক্ষা

✓ মানুষের সত্য জানার অধিকার আছে। কিন্তু সে অধিকার চর্চা করতে গিয়ে কারও অন্যায্য ক্ষতি করা যায় না; কাউকে অযাচিত ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেওয়া যায় না। সংবাদের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের নিরাপত্তা বা কোনো অন্যায্য ঝুঁকি ডেকে না আনতে সতর্ক থাকুন।

✓ অন্যের জন্য ক্ষতিকর না হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তির স্বার্থ ও অধিকার ন্যায্য। সাধারণভাবে ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টির দাবি বড়। কিন্তু সমষ্টি বা সমাজ যদি কোনো ব্যক্তির অন্যায্য ক্ষতি করে, তখন ব্যক্তিটির দাবি বড় হয়ে যায়। স্পর্শকাতর বিষয়ে ব্যক্তির ক্ষতি ও সমষ্টির কল্যাণের তুল্যমূল্য বিচার করে দেখবেন। সত্যপ্রকাশ কাদের কী মঙ্গল আনবে? কার কী ক্ষতি করবে? কোনটা কতখানি ন্যায্য বা অন্যায্য?

✓ জনস্বার্থে কারও অযাচিত কোনো ক্ষতি অনিবার্য মনে হলে সেটা যথাসম্ভব কমানোর বা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নিন। যেখানে প্রয়োজন, তার নাম-পরিচয় রিপোর্টে গোপন রাখুন। যারই অযাচিত ঝুঁকি আছে, সে, বিশেষ করে নারী ও শিশু এবং নিরীহ সাধারণ মানুষ, বিশেষ বিবেচনা দাবি করবে।

✓ এ ছাড়া, জনকল্যাণ বা জনস্বার্থের একান্ত যুক্তি ছাড়া কারও ব্যক্তিগত জীবনযাপনে (প্রাইভেসি) বিঘ্ন ঘটাবেন না, ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনে গোপনীয়তার অধিকার ক্ষুণ্ন করবেন না। জনব্যক্তিত্ব অথবা বিখ্যাত বা কুখ্যাত ব্যক্তিদের বেলায়ও (পাবলিক ফিগার, সেলিব্রিটি) এ নীতি প্রযোজ্য হবে।

— সংবেদনশীলতা, মানবিক মর্যাদা ও ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনযাপন

✓ সংবাদের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের প্রতি সংবেদনশীল থাকুন। মনে রাখুন যে, সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলা অস্বাচ্ছন্দ্য বা বিরক্তি সৃষ্টি করতে পারে। তাদের ব্যক্তিগত জীবনযাপনের অধিকার (প্রাইভেসি) ও মানবিক মর্যাদা (হিউম্যান ডিগনিটি) সম্পর্কে সজাগ থাকুন। অনধিকার চর্চা বা অনুপ্রবেশ করবেন না।

✓ মানুষের ক্ষতি, শোক-দুঃখ বা বিপর্যয়ের পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে সংবেদনশীল ও সমমর্মী থাকুন। কোনোভাবে তাদের কষ্ট বাড়াবেন না। প্রতিবেদনে ও ছবিতে তাদের উপস্থাপনের সময় সতর্ক থাকুন, যেন তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন না হয়। আরও মনে রাখুন, কারও মৃত্যুর পরও তার মানবিক মর্যাদার দাবি থাকে, থাকে তার নিকটজনের প্রতি আপনার দায়িত্বের প্রশ্ন।

✓ অন্যায্যভাবে, অহেতুক কারও সুনাম ক্ষুণ্ন করবেন না। সতর্ক থাকুন, যেন প্রতিবেদনের জের ধরে কাউকে অন্যায্যভাবে সামাজিক অপবাদ ও কলঙ্কসহ অন্যায্য দুর্ভোগ পোহাতে না হয়।

✓ যেখানে প্রয়োজন, ঘটনায় জড়িত ব্যক্তির নাম-পরিচয় রিপোর্টে গোপন রাখুন। বিশেষত নারী ও শিশু এবং নিরীহ সাধারণ মানুষ বিশেষ বিবেচনা দাবি করবে। যৌন নির্যাতন ও এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের মতো পরিস্থিতির শিকার ব্যক্তিদের ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক থাকুন।

— মানুষের মূল্যবোধ ও বিশ্বাস

✓ প্রতিবেদন ও ছবির মাধ্যমে কারও মূল্যবোধ বা বিশ্বাসকে আহত করবেন না।

✓ তবে সমাজের যেসব মূল্যবোধ বা বিশ্বাস ক্ষতিকর, কারও প্রতি বৈষম্যমূলক বা অন্যায্য, সেগুলোর বিরূপ প্রভাবের ঘটনা অবশ্যই তুলে ধরতে হবে।

— সুরুচি ও শালীনতা

✓ প্রতিবেদনে ও ছবিতে সাধারণ সুরুচি, শালীনতা ও এ-সংক্রান্ত মূল্যবোধের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাবেন না। সাধারণভাবে সমাজের মানুষজন যা কুরুচিকর বা অশ্লীল বলে মনে করে, তা এড়িয়ে চলবেন।

✓ সংবাদ-বিবরণ বা ছবি রগরগে করবেন না। বীভৎসতা বা নিষ্ঠুরতা ফুটিয়ে তোলায় ঝুঁকবেন না।

✓ সহিংসতা, মৃত্যু ও মৃতদেহ, হত্যা, শারীরিক আঘাত ও ক্ষত এবং যৌনতা ও যৌন উত্তেজক হতে পারে—এমন বিষয়ের বিবরণ ও ছবি সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্ক থাকুন।

— অপরাধ, সন্ত্রাস-সহিংসতা ও সমাজবিরোধী আচরণের বিবরণ

✓ লেখায় বা ছবিতে এসব আচরণের বিশদ বিবরণ দেবেন না। এগুলোকে রোমহর্ষক বা বিশাল কীর্তির মতো করে তুলে ধরবেন না।

✓ বিতর্ক আছে যে, এ ধরনের বিশদ বিবরণের ফলে মানুষ এসব কাজের প্রতি আকৃষ্ট হয় অথবা এ সম্পর্কে মানুষের বোধশক্তি ভোঁতা হয়ে যায়।

✓ প্রক্রিয়া-পদ্ধতির বিশদ বিবরণ সরাসরি এসব কাজ শেখাতে পারে।

✓ এসব খবরে আদালত অবমাননার ঝুঁকিসহ আইনগত ঝুঁকিগুলো সম্পর্কে সজাগ থাকবেন। *(দেখুন, অধ্যায় ৫-এর খ. অংশ)*

— স্বতন্ত্র অবস্থান

✓ সরকার ও বাণিজ্যিক শক্তিসহ ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালী কোনো পক্ষ অথবা নিজের স্বার্থ-মনোভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কোনো খবর করবেন না। স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র অবস্থান বজায় রেখে (ইনডিপেনডেন্স) ঘটনা ও বিষয় দেখুন এবং তুলে ধরুন।

✓ সাংবাদিকতার সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বন্দ্ব (কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট) উপস্থিত হতে দেবেন না।

- সংবাদের উৎস বা সূত্র হতে পারে, এমন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে দামি উপহার অথবা কোনো আর্থিক বা অন্য সুবিধা নেবেন না।

- কোনো ঘটনায় নিজের ঘনিষ্ঠ কেউ জড়িত থাকলে তা কর্তৃপক্ষকে জানাবেন এবং নিজে ওই রিপোর্ট করবেন না।

— স্ব-আরোপিত নিয়ন্ত্রণ (সেলফ-সেন্সরশিপ)

- ✓ স্ব-আরোপিত নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। ক্ষমতাশালী কারও অথবা সমাজের বিরাগের ভয়, নিজের স্বার্থের দ্বন্দ্ব, অতি-সাবধানতা—কোনো কারণেই নিজে থেকে ন্যায্য সত্য প্রকাশে পিছিয়ে যাবেন না।
- ✓ তবে সে রকম ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্র হলে অবশ্যই সাবধান হবেন। অহেতুক মাত্রাছাড়া ঝুঁকি নেবেন না; নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন।
- ✓ সম্পাদকীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতপার্থক্য অথবা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের সঙ্গে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হতে পারে মনে হলে আগে থেকে তথ্য চাপা দেবেন না। নৈতিকতার দাবির পক্ষে থাকার চেষ্টাটুকু অন্তত করবেন।

— দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা

- ✓ শ্রোতা-দর্শক-পাঠকের প্রতি, জনমানুষের প্রতি, সংবাদে জড়িতজনের প্রতি এবং সর্বোপরি সত্যের প্রতি দায়বদ্ধ থাকুন।
- ✓ নিজের কাজের ফলাফলের দায়িত্ব স্বীকার করুন। জবাবদিহি করতে প্রস্তুত থাকুন।
- ✓ ভুল করলে সেটা স্বীকার করুন, সংশোধন করুন এবং প্রতিকারের চেষ্টা করুন।
- ✓ সাংবাদিকের কাজের বিরুদ্ধে নাগরিকদের অভিযোগ দাখিল ও শুনানির কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সাংবাদিকদের সচেষ্ট হতে হবে।
- ✓ আত্মসমালোচনার অভ্যাস জারি রাখুন।

অধ্যায় ৪

শিশুর প্রেক্ষাপটে নীতি-নৈতিকতা

শিশুর প্রেক্ষাপটে সাংবাদিকতার সাধারণ নৈতিক বিবেচনাগুলোর কিছু কিছু বিষয় বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়। এরই জের ধরে কিছু বিশেষ প্রসঙ্গ নীতিমালায় সংযুক্ত হয় বা আলাদাভাবে চিহ্নিত হয়।

কেন বিশেষ মনোযোগ ও গুরুত্ব

আপনাকে সব সময় মনে রাখতে হবে, শিশুকাল হচ্ছে জীবনের গড়ে ওঠার বয়স। শেখার বয়স। নিজের জীবনকে নির্ভাবনায় উপভোগ করা ও নতুন নতুন আগ্রহ-কৌতূহল পরিতৃপ্ত করে বিচিত্র জগৎকে চেনা-বোঝা আস্বাদ করার বয়স। এ বয়সে শিশু নিজের কল্যাণের জন্য অন্যের ওপর নির্ভরশীল থাকে। তার বিশেষ যত্ন প্রয়োজন হয়। নির্যাতন, শোষণ বা ক্ষতিকর প্রভাবের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা তার থাকে না। তার শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক বিকাশের পুরো সুযোগ প্রয়োজন হয়। এটা শিশুর বিশেষ অধিকার। তার এ বিকাশে অল্পতেই চোট লাগতে পারে। তার যেকোনো ক্ষতি দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে।

অন্যদিকে, ব্যক্তি হিসেবে শিশু পূর্ণ মর্যাদা দাবি করে। পরিবারে ও সমাজে তার অংশগ্রহণ এবং মতপ্রকাশের অধিকারকে খাটো করা যায় না। শিশুর স্বার্থে সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা নিশ্চিত করতে গেলে আপনাকে এ সবগুলো বিষয়ে সংবেদনশীল, সতর্ক ও যত্নবান থাকতে হবে।

নিজের সবচেয়ে প্রিয় শিশুটির মুখ কল্পনা করুন। রিপোর্ট করার সময় তার কথা মনে রাখুন।

'উপেক্ষা' এবং 'চর্চা'

সাংবাদিকতার সার্বিক নীতি-নৈতিকতা প্রসঙ্গে এ বিষয়টি আলোচনায় চলে এসেছে। শিশুর প্রসঙ্গে সেটা আরেকটু স্পষ্ট করে বোঝা যাক। আপনি যে প্রতিবেদন করছেন, সেগুলোয় নীতি-নৈতিকতার দাবি মেটানো হচ্ছে দায়িত্বের একটি দিক। দায়িত্বের অন্য বড় মাত্রাটি হচ্ছে, যে কাজ বা বিষয়গুলো উপেক্ষিত রয়ে যাচ্ছে সেদিকে মনোযোগ দেওয়া। নীতি-নৈতিকতার ঘাটতি হতে পারে চর্চাগত। আবার, সেটা হতে পারে উপেক্ষাজনিত।

এ ক্ষেত্রে নীতি-নৈতিকতা মেনে সাংবাদিকতার লক্ষ্য :

- ✓ শিশুর সর্বোত্তম কল্যাণ নিশ্চিত করা—তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদি
- ✓ তার কোনো ক্ষতি না করা—তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদি

এ দুটি লক্ষ্য অর্জন করতে হলে সংবাদে উপেক্ষাজনিত বা চর্চাগত কোনো ঘাটতি রাখা যাবে না। অন্যভাবে বলতে পারি :

✓ শিশুর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের জন্য সংবাদে তাকে উপেক্ষা করা যাবে না, তার ন্যায্য হিস্যা বা ভাগ নিশ্চিত করতে হবে—

- শিশুর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে পর্যাপ্ত রিপোর্ট করতে হবে, শিশুর বাস্তবতা তুলে ধরায় কোনো ঘাটতি যেন না থাকে, প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তার মতামত-বক্তব্য যেন উপেক্ষিত না হয়।

- অন্যদিকে, শিশুর জানা-বোঝা-শেখার যে বিশেষ চাহিদা, সেটা পূরণ করে সাধারণ খবর বা শিশুবিষয়ক খবর করতে হবে।

✓ একই সঙ্গে, আপনি যেসব সংবাদ করছেন সেগুলোয় শিশুর কল্যাণের দিকে এবং তার কোনো ক্ষতি না করার ব্যাপারে মনোযোগী হতে হবে—

- শিশুকে কেন্দ্র করে বা স্পর্শ করে যেসব সংবাদ আপনি করছেন সেগুলোয় শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কিছু বিষয় নিশ্চিত করতে হবে এবং কিছু কাজ করা যাবে না। মনোযোগের প্রধান ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে—শিশুকে উপস্থাপন বা তার প্রতিফলন; শিশু ও তার স্বার্থের সুরক্ষা; শিশুর প্রতি সংবেদনশীলতা ও দায়িত্ব; শিশুর সাক্ষাৎকার নেওয়ার প্রশ্নে বিশেষ যত্ন; সংবাদে কোনো ফায়দা ওঠানোর জন্য শিশুকে ব্যবহার না করা; সার্বিকভাবে সবগুলো ক্ষেত্রে শিশুর নিরাপত্তা ও মর্যাদার ব্যাপারে বিশেষ যত্নশীল থাকা।

- অন্যান্য সংবাদে শিশুর ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলার মতো কিছু যেন না থাকে তা নিশ্চিত করা।

সুতরাং কিছু কাজ করা এবং কিছু কাজ না করা—দুদিকের দাবি মিটিয়েই আপনি শিশুর কল্যাণে ব্রতী থাকবেন। আপনি যে মাধ্যমে কাজ করেন তার চরিত্র এবং নির্দিষ্ট সংবাদের চাহিদা বুঝে আপনাকে সুনির্দিষ্ট করণীয় নির্ণয় করতে হবে। টেলিভিশন ও অনলাইন সাংবাদিকদের বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে।

সুরক্ষা ও অধিকারে ভারসাম্য

শিশুকে ক্ষতিকর প্রভাব/অনিষ্ট থেকে বাঁচাতে গিয়ে অথবা শিশুকে সুরক্ষা দিতে গিয়ে আপনি সতর্ক থাকবেন, যেন তার তথ্য পাওয়া ও মতপ্রকাশের অধিকার ক্ষুণ্ণ না হয়। অতি-সাবধানী হয়ে সেলফ-সেন্সরশিপ না করতে সজাগ থাকবেন।

শিশুর প্রেক্ষাপটে নীতি-নৈতিকতার বিশেষ বিবেচনাগুলো এবার একে একে ক্ষেত্র ধরে বিস্তারিত দেখা যাক। প্রথমে দেখব সব খবরে সাধারণ সতর্কতার কিছু বিষয়। তারপর নজর দেব শিশুকেন্দ্রিক এবং শিশুকে স্পর্শ করা খবর সম্পর্কে করণীয় ও অকরণীয়র ক্ষেত্রগুলোর দিকে।

'প্রতিটি শিশুকে রক্ষা এবং তাদের স্বাভাবিক বিকাশের স্বার্থে প্রতিটি জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।'—**ভূমিকা, শিশু অধিকার সনদ**

ক. সাধারণ সতর্কতা—সব খবরে

শিশুসংক্রান্ত সব খবরে পেশাদারি চর্চার দাবি তথা নীতি-নৈতিকতার মৌলিক বিবেচনাগুলো বিশেষভাবে জরুরি হয়ে আসে। এ ছাড়া যেসব খবরে শিশু অনুপস্থিত, সেগুলোর ক্ষেত্রেও অর্থাৎ খবরের সাধারণ অংশেও শিশু শ্রোতা-দর্শক-পাঠকের কথা ভুলে গেলে চলবে না। যেসব বিষয়ে বিশেষভাবে মনোযোগী ও সতর্ক থাকা দরকার তার মধ্যে রয়েছে :

— সঠিক, সত্য ও প্রয়োজনীয় তথ্য; সহজবোধ্যতা

এমন সংবাদ করা চাই, যা থেকে শিশু পরিবর্তনশীল জগৎ ও জীবন সম্পর্কে জানতে এবং বুঝতে পারে। শিশুরা সরল বিশ্বাসে সংবাদ থেকে বাস্তব সম্পর্কে জানে ও শেখে। সব সংবাদে সঠিক ও সত্য তথ্য পর্যাপ্ত এবং সহজবোধ্য হওয়া জরুরি। ভুল বা মিথ্যা তথ্য, অদায়িত্বশীল জল্পনাকল্পনা, বিকৃত সত্য, বৈষম্যমূলক বা পক্ষপাতদুষ্ট উপস্থাপনা—এসব শিশুর ওপর গুরুতর স্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। শিশু পাঠকের কথা মাথায় রেখে তথ্য ও মতামত-মন্তব্যকে পৃথক করা বিশেষভাবে জরুরি হয়; ভাষায় কোনো বিভ্রান্তির অবকাশ না রাখতে সতর্ক থাকতে হয়; ভাষা ও শব্দ ব্যবহার সঠিক ও সংবেদনশীল হতে হয়।

— সুরুচি ও শালীনতা

বিবরণ এবং ছবিতে কুরুচি, অশালীনতা, বীভৎসতা, নিষ্ঠুরতা, রগরগে চটক বা নগ্ন সহিংসতার প্রকাশ শিশুর ওপর নানামাত্রিক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এমন একটিমাত্র দৃষ্টান্তও স্থায়ী ক্ষতি করতে পারে; শিশুর মানসিক স্থিতিশীলতা নড়বড়ে হয়ে যেতে পারে।

বিশেষভাবে মনে রাখুন :

✓ **হত্যা, মৃত্যু ও মৃতদেহ**—হত্যার দৃশ্য বা উচ্চকিত বিবরণ শিশুর মনে ভয়-ভীতিসহ স্থায়ী ক্ষতিকর ছাপ ফেলতে পারে। মানুষের মৃত্যু ও মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধার নীতি বলে, মৃতজনকে উপহাস করা বা মৃতদেহের ছবি দেখানো যায় না। শিশু পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের কথা মাথায় রেখে এ নীতি মান্য করা সবিশেষ জরুরি হবে।

✓ **শারীরিক আঘাত, ক্ষত, অঙ্গহানি, বিকৃতি**—এসবের বীভৎস রক্তারক্তির ছবি বা নিষ্ঠুরতার বিশদ বর্ণনা শিশুকে ভীত-সন্ত্রস্ত-আতঙ্কিত করতে পারে; তার নিরাপত্তাবোধের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি হতে পারে; তার মনোজগৎ তছনছ করে দিতে পারে।

✓ **সহিংসতা**—সহিংসতার মাত্রাতিরিক্ত বিবরণ যেমন শিশুকে ভীতসন্ত্রস্ত করতে পারে, তেমনি এর প্রতি শিশুর অসুস্থ আগ্রহ তৈরি করতে পারে—তাকে নিষ্ঠুর বা সহিংস

আচরণে প্ররোচিত করতে পারে। আবার, সহিংসতাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়ে এ সম্পর্কে শিশুর বোধ ভোঁতা হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিও আছে।

✓ **যৌনতা**—যৌন উত্তেজক বিবরণ বা ছবি শিশুকে অকালে যৌনচর্চার দিকে আকৃষ্ট করতে পারে। বাংলাদেশের মতো রক্ষণশীল সমাজে এর একটি কুফল হতে পারে শিশু-কিশোরদের যৌন অপরাধপ্রবণতা।

—অপরাধ ও সমাজবিরোধী আচরণ এবং আত্মহত্যা

এসব ঘটনার সংবাদ করার সময় শিশুর কথা মাথায় রাখবেন। এর প্রভাব শিশুর ওপর প্রত্যক্ষ ও ব্যাপক হতে পারে।

✓ **চাঞ্চল্যকর, রোমহর্ষক**—অপরাধ ও সমাজবিরোধী আচরণকে বিশাল করে দেখালে শিশু এর প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে।

✓ **প্রক্রিয়া-পদ্ধতি**—অপরাধ বা ক্ষতিকর আচরণের প্রক্রিয়া-পদ্ধতির বিশদ বিবরণ, যেমন—কোনো মাদক কীভাবে ব্যবহার করতে হয় বা কোথায় পাওয়া যায়, শিশুকে কাজটি শেখাতে পারে।

✓ **আত্মহত্যায় প্ররোচণা**—আত্মহত্যা বা আত্মনিগ্রহের বিশদ বিবরণ সম্পর্কেও একই কথা। বিশেষভাবে সতর্ক থাকুন, কোনো শিশু/কিশোরবয়স্ক কেউ যখন আত্মহত্যা করে এবং সেটার কারণ যখন থাকে যৌন হয়রানি বা উত্যক্তকরণ। *(দেখুন, অধ্যায় ৫-এর গ. অংশে)*

—মূল্যবোধ ও বিশ্বাস

সমাজে বিদ্যমান মতামত, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের বৈচিত্র্যের প্রতি সহনশীলতা শিশুর জন্য একটি জরুরি শিক্ষা।

✓ **উদারতার শিক্ষা**—বিবরণ বা ছবিতে কোনো মূল্যবোধ বা বিশ্বাসের প্রতি অযাচিত অশ্রদ্ধার প্রকাশ শিশুর মানসিকতাকে সংকীর্ণ করে গড়তে পারে।

✓ **অন্যায়কে চেনা**—অন্যদিকে এটাও জরুরি যে, শিশু যেন সমাজের অন্যায্য বা বৈষম্যমূলক মূল্যবোধগুলো অবাঞ্ছনীয় বলে চিনতে শেখে।

খ. শিশুকেন্দ্রিক খবর : করণীয় ও অকরণীয়

এ পর্যায়ে আমরা নজর দেব শিশুকে নিয়ে এবং শিশুর জন্য সংবাদের বিশেষ চাহিদাগুলোর দিকে। প্রথমেই উপেক্ষাজনিত দুটি দিক দেখব। তারপর সংবাদে জড়িত শিশু সম্পর্কে করণীয় ও অকরণীয়র প্রসঙ্গে যাব।

—সংবাদে উপেক্ষা না করা

সংবাদে শিশুকে উপেক্ষা না করার কয়েকটি মাত্রা রয়েছে। সবগুলোই আপনার বিশেষ মনোযোগ দাবি করবে।

✓ **যথাযথভাবে পর্যাপ্ত সংবাদ করা চাই**—শিশুকেন্দ্রিক এবং শিশুদের জন্য জরুরি ঘটনা বা বিষয়গুলো উদ্যোগী হয়ে খুঁজবেন; লেগে থেকে খবর করবেন। এসব সংবাদ যথাযথভাবে সঠিক প্রেক্ষাপটে পরিষ্কার বোঝা যাওয়ার মতো করে করা দরকার।

✓ **বৈচিত্র্যের প্রতিফলন ও ন্যায্য মনোযোগ চাই**—শিশুদের নানা অংশ এবং তাদের বিচিত্র প্রয়োজন ও আগ্রহের যথাযোগ্য প্রতিফলন চাই। শিশুদের নিয়ে খবর করায় কোনো বৈষম্য, অসতর্ক ঘাটতি বা অবহেলা না ঘটাতে সজাগ থাকবেন। নাজুক অবস্থান ও বঞ্চনার শিকার গোষ্ঠীগুলো বাড়তি মনোযোগ দাবি করবে।

✓ **শিশু অধিকারের নজরদারি চাই**—শিশু অধিকারসংশ্লিষ্ট বিষয় ও পরিস্থিতির নিয়মিত এবং পর্যাপ্ত নজরদারি চাই। জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ যেমনটা বলছে এবং নিজেদের প্রিয় শিশুদের কথা ভাবলে যা সহজেই বুঝতে পারি, প্রতিটি শিশুর অধিকার আছে সুস্থ ও নিরাপদ জীবন এবং পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পাওয়ার। এ অধিকার বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় সহায়ক হওয়া সাংবাদিকের নৈতিক দায়িত্ব।

শিশুসংক্রান্ত বিষয়ে রিপোর্টিংয়ের জন্য সাংবাদিকদের একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন আইএফজের নীতিমালা দায়িত্বটি এভাবে বর্ণনা করছে—

'শিশু অধিকারের লঙ্ঘন এবং শিশুদের কুশল ও নিরাপত্তা (সেফটি), ব্যক্তিগত জীবনযাপনে নির্বিঘ্নতা ও নিভৃতি, স্বস্তি-সুরক্ষা (সিকিউরিটি), শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক কল্যাণ এবং তাদের সর্বপ্রকার শোষণের বিষয়গুলো সংবাদমাধ্যম তাদের অনুসন্ধান ও জনবিতর্কের (পাবলিক ডিবেট) জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করবে, করা উচিত।' (আইএফজে, ২০০২)[২]

শিশুর অধিকার বঞ্চনা বা লঙ্ঘনের দায় কার এবং সে ব্যাপারে সরকার বা কর্তৃপক্ষের ভূমিকাও আপনি চিহ্নিত করবেন।

✓ **আওতা বাড়াতে হবে**—শিশুসংক্রান্ত বিষয়ে রিপোর্টের আওতা বাড়ানো দরকার। সব সময় ভাববেন, কীভাবে শিশুর কোন বিষয়টি আরও কার্যকরভাবে সমাজ ও নীতিনির্ধারকদের নজরে আনা যায়। *(দেখুন, অধ্যায় ৫-এর ক, খ, ও ঘ, অংশে)*

— শিশুর কণ্ঠস্বরকে উপেক্ষা না করা

সংবাদে শিশুর বক্তব্য ও মতামত তুলে ধরার কয়েকটি মাত্রা আছে। সবগুলোই আপনার বিশেষ মনোযোগ দাবি করবে।

✓ **ঘটনায় যখন শিশু সরাসরি যুক্ত**—যেসব ঘটনা বা বিষয়ে শিশু বা তার স্বার্থ সরাসরি জড়িত আছে, সেগুলোর প্রতিবেদনে আপনি অবশ্যই শিশুদের বক্তব্য ও মতামত গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরবেন। রিপোর্টগুলো শুধু বড়দের কথা নিয়ে করবেন না।

---

[২]আইএফজের শিশুসংক্রান্ত বিষয়গুলো রিপোর্ট করার নির্দেশনা ও নীতিমালা ৭০টি দেশের সাংবাদিকদের সংগঠনের প্রতিনিধিরা প্রথম গ্রহণ করেছিল ব্রাজিলে জাতিসংঘের সহায়তায় আয়োজিত এক সম্মেলনে। এই খসড়া নীতিমালা পরে ২০০১ সালে চূড়ান্ত করা হয়।

✓ **প্রাসঙ্গিক যেকোনো ঘটনায়/বিষয়ে শিশুর ভাবনাচিন্তা**—বড়রা যা করেন, যেসব সিদ্ধান্ত নেন, শিশুর জীবনের ওপর তার গভীর প্রভাব পড়ে। সুতরাং যেকোনো বিষয়ের সংবাদ করার সময় ভেবে দেখবেন যে, শিশুর ওপর এর কোনো প্রভাব পড়তে পারে কি না বা শিশুর মতামতের কোনো প্রাসঙ্গিকতা আছে কি না। সে অনুযায়ী শিশুদের বক্তব্য ও মতামত নেবেন; বক্তার বয়স ও যুক্তি-বুদ্ধির পরিণতি অনুপাতে গুরুত্ব দিয়ে তা তুলে ধরবেন।

✓ **বৈষম্য নয়**—শিশুর বক্তব্য ও মতামত নেওয়ার প্রশ্নে বক্তা বাছাইয়ে কোনো বৈষম্য না করতে সজাগ থাকবেন।

—শিশুকে উপস্থাপন, শিশুর চরিত্রচিত্রণ (পোরট্রেয়াল)

সংবাদে শিশুকে কী চোখে দেখা হয়, তাকে কীভাবে উপস্থাপিত করা হয় বা তার চরিত্র কীভাবে রূপায়িত হয় সেটা নানা কারণেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইউনিসেফের একটি প্রকাশনায় বিষয়টির সারমর্ম মেলে :

> 'সংবাদমাধ্যমে শিশুকে যেভাবে দেখানো হয়, তা শিশু ও শৈশব সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এটা শিশুদের প্রতি বড়দের আচরণের ওপরও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। সংবাদমাধ্যমে শিশুর রূপায়ণ অল্পবয়সীদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত (রোলমডেল) গড়ে তোলে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রত্যাশাকে প্রভাবিত করে। সংবাদমাধ্যম শিশুকে যেভাবে প্রতিফলিত করে, বা এমনকি উপেক্ষিত করে, তা শিশুদের জন্য নেওয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে। সমাজের অন্যান্য অংশ কী চোখে শিশুকে দেখবে, সেটাও প্রভাবিত হয়। সংবাদমাধ্যম প্রায়ই শিশুকে নিষ্ক্রিয়, নীরব ভুক্তভোগী বা ভিকটিম হিসেবে দেখায়...।' ('*চিলড্রেনস রাইটস অ্যান্ড জার্নালিজম প্রাকটিস—এ রাইট বেজড্ পার্সপেকটিভ*' ইউনিসেফ সিইই/সিআইএস, ২০০৭)

ওপরে উদ্ধৃত আলোচনার পরবর্তী অংশে আরও যেমনটা পরামর্শ দিয়েছে—আপনি সমাজকে মনে করিয়ে দিতে পারেন যে, ব্যক্তি হিসেবে প্রতিটি শিশুই সম্মান ও মর্যাদার দাবিদার।

মনে রাখুন :

✓ **ছাঁচে ফেলে নয়**—ছাঁচে-ঢালা (স্টিরিওটাইপড) উপস্থাপন বা চরিত্রচিত্রণ করবেন না। অন্যান্য দেশে একাধিক গবেষণা এবং বাংলাদেশে একটি সমীক্ষা (এমআরডিআই/ইউনিসেফ, ২০০৯) দেখেছে, কিছু চরিত্রচিত্রণ বা মনোভাব মোটামুটি সর্বজনীন। যেমন, শিশু-কিশোরদের ভুক্তভোগী (ভিকটিম), অসহায়, অঘটনপটিয়সী বা উচ্ছৃঙ্খল এবং 'দুধভাত' হিসেবে দেখা। আরও দেখা যায়, সংবাদে মেয়েরা বেশি উপস্থাপিত হচ্ছে অপরাধ বা নির্যাতনের ভুক্তভোগী হিসেবে এবং ছেলেরা বেশি আসছে 'অপরাধী' হিসেবে। আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে ঘটনার বিবরণে, যেন জড়িত শিশু-কিশোরটির গায়ে এমন কোনো ছাপ্পা এঁকে দেওয়া না হয় বা এমন কোনো ছাঁচে ঢালা ধারণা প্রতিষ্ঠিত না হয়।

✓ **সাধারণীকরণ নয়**—শিশুকে উপস্থাপনের সময় যেকোনো সাধারণীকরণ (জেনারালাইজেশন) এড়িয়ে চলুন। ঘটনা বা প্রসঙ্গ ধরে সুনির্দিষ্ট তথ্য ও বিবরণ দেবেন।

✓ **বৈষম্যমূলক উপস্থাপন নয়**—আরও সতর্ক থাকুন, কোনো শিশুর উপস্থাপনে যেন জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, ইত্যাদি কোনো মাপকাঠিতেই বৈষম্য প্রকাশ না পায়। প্রতিবেদনের বিষয়ের জন্য একান্ত প্রাসঙ্গিক না হলে এমন কোনো পরিচয় বা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করবেন না।

— সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা

শিশুকে কোনো ক্ষতি, ঝুঁকি বা কলঙ্ক থেকে সুরক্ষা দেওয়ার বিবেচনায় নানা মাত্রা আছে। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ভাবতে হয়। বাংলাদেশের আইনেও কিছু ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমে শিশুর সুরক্ষার জন্য বিধিবিধান আছে। *(দেখুন অধ্যায় ৫-এর খ. অংশ)*

মনে রাখুন :

✓ **ঝুঁকি বিচার**—যেকোনো পরিস্থিতিতে শিশুর নাজুক অবস্থানের বিভিন্ন দিক ভালো করে ভেবে দেখবেন, শিশু ও তার অভিভাবক/শুভানুধ্যায়ী বড় কারও সঙ্গেও আলাপ করে বুঝবেন। শিশুর শারীরিক বা মানসিক সব রকম অনিষ্টের ঝুঁকি বিবেচনা করবেন।

✓ **নিরাপত্তার ঝুঁকি বড় বিবেচনা**—খবর করার তাগিদের চেয়ে জড়িত শিশুটির কোনো বিপদ বা নিরাপত্তাহানির আশঙ্কাকে বেশি গুরুত্ব দেবেন এবং সেটা বুঝে সব সিদ্ধান্ত নেবেন।

✓ **মর্যাদা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা**—শিশুর মর্যাদার সংরক্ষণে বাড়তি মনোযোগী হবেন। আরও মনে রাখবেন, শিশুদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বা নিভৃতির (প্রাইভেসি) প্রয়োজন বড়দের চেয়েও বেশি। শিশুর যেকোনো ব্যক্তিগত তথ্য প্রতিবেদনে দেওয়ার আগে তার আঞ্জাম খুব ভালো করে ভেবে নেবেন। সম্মতির প্রশ্ন খুব জরুরি হবে; সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে সেটা আলাদা করে দেখা হয়েছে।

এদিকে যুক্তরাজ্যের প্রেস কমপ্লেইন্টস কমিশন—পিসিসির আচরণবিধি সতর্ক করে দিচ্ছে যে, কেবল পিতামাতা বা অভিভাবকের খ্যাতি, দুর্নাম বা অবস্থানের কারণে কোনো শিশুর ব্যক্তিগত জীবনের বিশদ তথ্য প্রতিবেদনে টেনে আনা যায় না।

✓ **কলঙ্ক ও বিড়ম্বনা**—বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সামাজিক কলঙ্কের আশঙ্কা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হবে। পথশিশু থেকে শুরু করে যৌন নিপীড়নের শিকার শিশু অথবা পিতৃপরিত্যক্ত পরিবারের শিশু, অনেক ক্ষেত্রেই সতর্ক পদচারণা দাবি করবে।

✓ **বৈষম্য ও আঘাতের ঝুঁকি**—সতর্ক থাকবেন যেন সংবাদের সুবাদে কোনো শিশু বৈষম্যের শিকার না হয়, অথবা অযাচিতভাবে আহত বোধ না করে।

✓ **রিপোর্টে শিশুকে শনাক্ত করা**—কখনো শিশুর শনাক্তকরণ অর্থাৎ রিপোর্টে তার নাম-পরিচয় প্রকাশ করা শিশুটির জন্য ভালো হতে পারে। যেমন, কোনো শিশু হয়তো কিছু বলতে চাইছে বা প্রচার তাকে সাহায্য করতে পারে। ইতিবাচক পরিস্থিতিতে বা কোনো ঝুঁকির প্রশ্ন না থাকলে এবং তার সম্মতি সাপেক্ষে তাকে শনাক্ত করতে বাধা নেই। তবে

সাধারণভাবে, রিপোর্টে শিশুকে শনাক্ত করার সিদ্ধান্ত খুব ভাবনাচিন্তা করে নিতে হবে; যত কম বয়স, তত সূক্ষ্ম বিবেচনা চাই। তথ্য সংগ্রহ ও রিপোর্ট তৈরির প্রতি ধাপে বিষয়টি আলাদা করে বিচার করবেন। বিবেচনার বিশেষ ক্ষেত্র এবং করণীয়গুলো আলাদা করে দেখা যাক :

- **স্পর্শকাতর বিষয়ে** এবং যখনই দ্বিধা হবে শিশুর নাম পাল্টে দেবেন; ছবি ছাপালে চেহারা ঝাপসা করে দেবেন; গলা শোনালে তা অস্পষ্ট করে দেবেন। এ ছাড়া, তাকে শনাক্ত করার মতো যাবতীয় তথ্য ছেঁকে বাদ দেবেন। এমন তথ্য হতে পারে ঠিকানা এমনকি গ্রামের নাম, বাবা-মার নাম, নিকটাত্মীয় কারও পরিচয় ও নাম, স্কুলের নাম। সতর্ক থাকুন টুকরো টুকরো তথ্য জুড়ে যেন পরিচয় বেরিয়ে না পড়ে।

- **নির্যাতনের শিকার** কোনো শিশুর ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা চাই। পরিচয় প্রকাশ তাকে অধিকতর নির্যাতনের ঝুঁকিতে ফেলবে কি না, অথবা তার নিরাপত্তার হানি ঘটাবে কি না, সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা হবে।

- **যৌন নির্যাতন বা যৌন শোষণের শিকার** শিশুকে শনাক্ত করবেন না। তার সামাজিক কলঙ্কের ঝুঁকিটি বড়। আইনগত বাধা আছে। যৌন নির্যাতনের কোনো সাক্ষী শিশু হলে তার পরিচিতি গোপন রাখবেন।

- **অপরাধের সঙ্গে জড়িত** হয়ে পড়া শিশু-কিশোরেরা একই রকম গোপনীয়তা দাবি করে। রিপোর্টে তাদের শনাক্ত করবেন না।

- **বাংলাদেশের আইন** বলছে, সংবাদমাধ্যমে যৌন নির্যাতনসহ বেশকিছু নির্যাতনের শিকার শিশু এবং আইনপরিপন্থী কাজে জড়িত শিশুর শনাক্তকরণ করা যাবে না। *(দেখুন অধ্যায় ৫-এর খ. অংশ)*

- **মৃত্যুর পরও** পরিচয়ের সুরক্ষা প্রয়োজন হয়। যৌন নির্যাতনের শিকার শিশু ও আইনপরিপন্থী কাজে জড়িয়ে পড়া শিশুসহ স্পর্শকাতর বিষয়ে শিশুর মৃত্যু ঘটলেও তার নাম-পরিচয় গোপন রাখবেন। নয়তো পরিবারের অন্য শিশুদের ওপর সামাজিক কলঙ্কের জের আসতে পারে। নিকটজনদের আহত করার ঝুঁকি আছে। তবে কখনো অভিভাবকেরা সম্মতি দিলে হয়তো ভিন্ন বিবেচনা হতে পারে।

- **কোনো শিশুর বাবা-মা কোনো অপরাধে অভিযুক্ত হলে** শিশুকে রিপোর্টে টেনে আনবেন না বা কোনোভাবে শনাক্ত করবেন না।

সতর্ক থাকুন, রিপোর্ট যেন—

- ✓ শিশুকে ক্ষতিকর কিছু না শেখায়।
- ✓ সন্ত্রাস/সহিংসতা/সমাজবিরোধী কাজের বিশদ বা অসুস্থ বিবরণ না হয়।
- ✓ শিশুর মানসিক চাপের কারণ না হয়/আতঙ্ক বা ভয় না জাগায়/বীভৎসতাকে প্রধান করে না তোলে।
- ✓ শিশুর মুক্ত চিন্তাকে ব্যাহত না করে।
- ✓ বৈষম্য প্রকাশ না করে, বৈষম্য না শেখায়।
- ✓ ছাঁচে-ঢালা চিন্তাভাবনা বা প্রতিফলন তুলে না ধরে।
- ✓ রুচি বিকৃতির প্রকাশ না করে/সেটাকে উৎসাহ না দেয়।
- ✓ শিশুর প্রতি যৌন আকর্ষণ উদ্রেককর বিবরণ/ছবি না হয়।
- ✓ শিশুকে বিপদে না ফেলে, তার প্রতি কলঙ্ক আরোপ না করে।
- ✓ শিশুর মতামতকে উপেক্ষা না করে।

- **ইউনিসেফ ও ইয়োরোপভিত্তিক এনজিও মোর্চা** চিলড্রেন'স রাইটস ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক—ক্রিন কয়েকটি পরিস্থিতিতে জড়িত শিশুকে শনাক্ত করতে নিষেধ করছে। এগুলো হচ্ছে : যৌন নির্যাতন বা শোষণের শিকার শিশু (শিশু যৌনকর্মীরা এর মধ্যে পড়বে); শারীরিক বা যৌন নিপীড়নকারী শিশু; এইচআইভি-সংক্রমিত বা এইড্স-আক্রান্ত শিশু এবং (সে তার বাবা-মা বা অভিভাবকেরা সজ্ঞান সম্মতি দিলে ভিন্ন বিবেচনা হতে পারে) ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত বা দণ্ডপ্রাপ্ত শিশু। এদের নীতিমালা শিশুসৈন্য, শরণার্থী শিশু বা উদ্বাস্তু শিশুদের ছবি ছাপাতে নিষেধ করছে।
- **কেবল জড়িত শিশুর ওপর নয়,** শনাক্তকরণের প্রভাব তার বন্ধুবান্ধব, শিশুবয়স্ক ভাইবোন, বাবা-মা, পরিবার বা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত অন্যান্য নাজুক পক্ষের ওপর কী রকম হবে সেটাও বিবেচনা করবেন। ক্রিন-এর নীতিমালা বলছে, সাংবাদিকেরা নাম পাল্টে বা শনাক্তকরণ ঝাপসা করেও এমন কোনো সংবাদ বা ছবি প্রকাশ করবেন না, যা থেকে কোনো শিশু, তার ভাইবোন বা বন্ধুবান্ধবদের কোনো ক্ষতি হতে পারে।
- **সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে রিপোর্টের বিষয়ের তাৎপর্য বুঝে নিজের বিবেচনা খাটিয়ে** আপনি কোনো শিশুকে শনাক্ত করা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন। বাংলাদেশে যেমন এইচআইভি/এইড্সের কারণে মৃত বাবা-মাকে শনাক্ত করলেও তা তাদের সন্তানদের জন্য বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। শিশু যৌনকর্মী তো বটেই, যৌনপল্লীতে বসবাসরত শিশুদেরও শনাক্ত করা যায় না।

- **প্রয়োজনে সাধারণ প্রবণতা তুলে ধরুন।** ক্ষেত্রবিশেষে, ক্ষতি হবে বুঝলে, কোনো শিশুকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত না করে ঘটনাটি সাধারণভাবে তুলে ধরার উপায় খুঁজতে পারেন।

এ অধ্যায়ে পরে 'যাদের অবস্থান বিশেষভাবে নাজুক বা অরক্ষিত' শীর্ষক আলোচনাটিও দেখুন।

— সংবেদনশীলতা ও দায়িত্ব

সংবাদের ঘটনায় যুক্ত মানুষদের প্রতি সংবেদনশীলতা, সমমর্মিতা ও দায়িত্বশীলতার দাবি বহু গুণ বেড়ে যায় যদি তারা শিশু হয়।

মনে রাখুন :

✓ **উদ্বেগ, ক্লেশ**—কোনোভাবেই শিশুর অস্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করা যাবে না। শোক-বিপর্যয়ের পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে সতর্ক থাকুন, যেন শিশুর মানসিক উদ্বেগ, পীড়া বা দুর্ভোগ না বাড়ে।

✓ **মমতা, সমমর্মিতা**—রিপোর্টে শিশুকে উপস্থাপনের যেকোনো সিদ্ধান্ত নেবেন, শিশুর সঙ্গে কথা বলবেন, তার পরিস্থিতির প্রতি বিশেষভাবে সমমর্মী হয়ে সহানুভূতি রেখে।

✓ **প্রতিক্রিয়া ভাবা**—জড়িত শিশুটির ওপর রিপোর্টের সম্ভাব্য বিরূপ/অস্বাচ্ছন্দ্যকর তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদি প্রতিক্রিয়া বা ফলাফল ভেবে দেখবেন, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। আপনার সত্যকথনের দায়িত্বকে শিশুর প্রতি দায়িত্বের সঙ্গে ভারসাম্য করতে হবে।

✓ **প্রকাশের পর**—রিপোর্ট প্রকাশের পর শিশুটির খোঁজ নেবেন। তার কেমন লেগেছে জানতে চাইবেন। কোনোকিছু তার খারাপ লাগলে ক্ষমা চাইবেন; সমর্থন-সহযোগিতা জোগাবেন; প্রয়োজনে প্রতিবিধানের চেষ্টা করবেন।

✓ **তৃতীয় পক্ষকে তথ্য দেওয়া**—বিবিসির সম্পাদকীয় নীতিমালা যেমনটা বলছে, কখনো তৃতীয় কোনো পক্ষকে কোনো শিশু সম্পর্কে ব্যক্তিগত তথ্য দেওয়ার প্রশ্ন এলে (যেমন পুলিশকে) শিশুর পক্ষকে জানিয়ে তাদের সম্মতি নেওয়া দরকার হবে।

— সাক্ষাৎকার নেওয়া, তথ্য যাচাই

রিপোর্টে শিশুর বক্তব্য, তার পর্যবেক্ষণ-অনুভূতি বা চিন্তাভাবনা-মতামত তুলে ধরা দরকার। কিন্তু কোনো শিশুর সঙ্গে কথা বলতে বিশেষ যত্ন, সতর্কতা ও কিছু নীতি মান্য করা জরুরি হবে। দক্ষতা যেমন দরকার, তেমনি চাই সুবিবেচনা ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি।

মনে রাখুন :

✓ **শিশুর স্বার্থ, সংবাদের নয়**—শিশুর সঙ্গে কথা বলার সিদ্ধান্ত নেবেন শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ বিবেচনা করে। খবর করার স্বার্থ অগ্রাধিকার পাবে না। সংবাদে যদি তার কথা বা ছবি না-ও প্রকাশ করেন, ক্ষেত্রবিশেষে কথা বলা বা ছবি তোলার প্রক্রিয়াটিই কিন্তু শিশুর জন্য

ক্ষতিকর হতে পারে। স্পর্শকাতর বিষয়ে সব সময় ভাববেন যে, তথ্যগুলো জানার বিকল্প কোনো সুযোগ আছে কি না।

✓ **ঘটমান ঘটনায় বিশেষ সতর্কতা**—ঘটমান ঘটনা বা ব্রেকিং নিউজের তাৎক্ষণিক তাড়াহুড়োর মধ্যে এবং টিভির ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক বা লাইভ সম্প্রচারের বেলায় কোনো শিশুর সঙ্গে কথা না বলাই ভালো হবে। তার কোন কথার কী মানে দাঁড়াবে তা শিশু তাৎক্ষণিক না-ও বুঝতে পারে। তাড়াহুড়োয় আপনিও অনভিপ্রেত প্রশ্ন করে ফেলতে পারেন। যদি কথা বলতেই হয়, খুবই সতর্ক থাকুন।

✓ **সজ্ঞান সম্মতি, অভিভাবকেরও**—শিশুর সঙ্গে কথা বলা ও তার ছবি তোলার আগে তার এবং/অথবা তার অভিভাবক বা অভিভাবকস্থানীয় কারও সজ্ঞান সম্মতি নিশ্চিত করবেন। শিশুর বয়স যত কম, তার অবস্থান যত নাজুক বা ঘটনা যত স্পর্শকাতর, তার প্রাপ্তবয়স্ক ও দায়িত্বশীল কোনো প্রতিনিধির অনুমতি তত বেশি জরুরি হবে। প্রয়োজনে লিখিত সম্মতি নেবেন।

সোজাসুজি নিজের পরিচয় দেওয়ার পর আপনার উদ্দেশ্য পরিষ্কার খুলে বলবেন। তারা যেন রিপোর্টের ধরন এবং এর সম্ভাব্য স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল বুঝতে পারে, তা নিশ্চিত করবেন।

ভেবে দেখুন, শিশুটি যদি আপনার নিজের হতো আপনি কী চাইতেন? কোন কোন বিষয়ে আপনার দুর্ভাবনা হতো? নিজের বিবেচনা প্রয়োগ করুন। কেননা শিশু বা অনভিজ্ঞ অভিভাবক সংবাদমাধ্যমে প্রচারের তাৎপর্য—বিশেষত দীর্ঘমেয়াদি—না-ও বুঝতে পারে। যদি ঝুঁকিপূর্ণ মনে হয়, তা হলে তারা সম্মতি দিলেও কথা বলবেন না বা সে তথ্য ব্যবহার করবেন না।

✓ **আপত্তিকে সম্মান**—কেউ কথা বলতে আপত্তি জানালে সেটা মানবেন। কখনো অভিভাবক সম্মতি দিলেও শিশু যদি আপত্তি করে, সেটা মেনে নেবেন।

✓ **প্রসঙ্গ যখন শিশুর মঙ্গল-অমঙ্গল**—কোনো কোনো নীতিমালা বলছে শিশুর কাছ থেকে তার নিজের বা অন্য কোনো শিশুর মঙ্গল-অমঙ্গলের সঙ্গে জড়িত কোনো তথ্য নিতে খুব সতর্ক থাকতে। যুক্তরাজ্যের পিসিসির নীতিমালা বলছে শিশুর বয়স ১৬ বছরের কম হলে দায়িত্বশীল বড় কারও সম্মতি ছাড়া এমন তথ্য না নিতে।

✓ **এক্তিয়ার, আয়ত্ত**—শিশুর এক্তিয়ার বা আয়ত্তের বাইরে কোনো বিষয়ে তার কাছ থেকে তথ্য বা মতামত চাইবেন না। এগুলো এমন বিষয় হতে পারে, যা নিয়ে তার কথা বলা সংগত নয় বা বললে তার বিপদ হতে পারে। বিশেষভাবে সতর্ক থাকুন ঘটমান ঘটনা বা ব্রেকিং নিউজের সংবাদ সংগ্রহের সময়।

✓ **ছেঁকে ধরা নয়**—কোনো শিশুকে একসঙ্গে অনেক সাংবাদিক মিলে প্রশ্ন করবেন না। বরং তথ্য ভাগাভাগি করে নিন।

✓ **চাপ বা প্রলোভন নয়**—শিশুকে কথা বলতে কোনো চাপ দেবেন না, প্রলোভনও দেখাবেন

না। সম্মতি আদায়ের জন্য টাকাপয়সা বা সে রকম কোনো প্রতিশ্রুতি দেবেন না। কথা বলার সময় সতর্ক থাকবেন, শিশু যেন আপনার আচরণে বা হাবভাবে ভয় না পায় বা দমিত বোধ না করে। শিশুর স্পর্শকাতর মানসিকতা সম্পর্কে সতর্ক থাকুন।

✓ **সম্মান, শ্রদ্ধা, দায়িত্বশীলতা**—সাক্ষাৎকারের সময় শিশুটির প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখাবেন। তাকে গুরুত্ব দেবেন।

- সৌজন্যের সঙ্গে তার পুরো নাম জিজ্ঞাসা করে, কেমন লাগছে জানতে চেয়ে আলাপ শুরু করবেন। তাকে ব্যক্তির মর্যাদা দেবেন। সংবেদনশীল হয়ে মমতার সঙ্গে প্রশ্ন করবেন।
- কোনোভাবেই তাকে বিপর্যস্ত বা ব্যতিব্যস্ত করবেন না। তাকে পুরো কথা বলতে সময় দেবেন, ধৈর্য ধরে শুনবেন।
- তার কথার প্রতি তাচ্ছিল্য দেখাবেন না। তাকে বিচার বা মূল্যায়ন করার মনোভাব রাখবেন না।
- তবে শিশুটি যদি কোনো ক্ষতিকর কাজে যুক্ত হয়ে থাকে, সে কাজের গুরুত্বকে কোনোভাবে হালকা করে উপস্থাপন করবেন না।
- এ ছাড়া, শিশুকে সুরক্ষা দিতে গিয়ে অতিসাবধানী হয়ে পিঠ চাপড়ানো বা অনুকম্পার মনোভাব দেবেন না। আপনার হাবভাবেও যেন তেমনটা প্রকাশ না পায়।

✓ **নিভৃতি, গোপনীয়তা, আস্থা**—শিশুর নিভৃতি বা কিছু গোপন করার ইচ্ছাকে সম্মান দেখাবেন। তার আস্থা গড়ে তুলবেন এবং সেটা রক্ষা করবেন। এমন কিছুর প্রতিশ্রুতি তাকে দেবেন না, যা রাখা সম্ভব নয়। অবাস্তব আশা বা প্রত্যাশা তৈরি করবেন না।

✓ **একসঙ্গে বনাম একা**—অনেক সময় কয়েকজন শিশুর সঙ্গে একত্রে কথা বললে তারা স্বচ্ছন্দ ও নিরাপদ বোধ করতে পারে। তবে বিষয়ভেদে কখনো হয়তো একা কথা বলা নিরাপদ হবে।

✓ **স্পর্শকাতর বিষয়, শোক-বিপর্যয়**—বিষয় স্পর্শকাতর হলে শিশুর উদ্বেগ বা কষ্ট না বাড়ানোর ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগী ও সচেষ্ট থাকবেন। কথা বলার সময় শিশুটির পরিচিত ও আস্থাভাজন বড় কাউকে সঙ্গে রাখা ভালো হতে পারে।

- শোকগ্রস্ত বা বিপর্যস্ত, নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার শিশু তথা ভিকটিম এবং আইনপরিপন্থী কাজে অভিযুক্ত বা জড়িত শিশুর সঙ্গে কথা বলার জন্য ভালোভাবে ভেবেচিন্তে প্রস্তুতি নিয়ে এগোনো দরকার। কথা বলা যুক্তিযুক্ত হবে কি না এবং বললে কোন পন্থা ভালো হবে, তা জানতে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেবেন। তেমন বুঝলে নাজুক অবস্থায় শিশুর সঙ্গে কথা বলবেন না।

✓ **তথ্য যাচাই ও সতর্কতা**—বুঝতে হবে যে, শিশু কখনো আপনাকে খুশি করতে চেয়ে কিছু বলে ফেলতে পারে। কখনো সে বাহ্‌বা নিতে বাড়িয়ে কিছু বলতে পারে বা কল্পনাপ্রবণ হয়ে কথা বলতে পারে। কখনো হয়তো সে কানকথা তুলে ধরতে পারে। সেজন্য শিশুর

দেওয়া তথ্য সব সময় ভালো করে যাচাই করে নেবেন। তবে যাচাই করার সময় শিশুটির কথা উল্লেখ করবেন না এবং সতর্ক থাকবেন, যেন কোনোভাবে সে বিপদে না পড়ে।

✓ **টাকা না-দেওয়া ও দেওয়া**—শিশু বা তার অভিভাবককে তাদের নিজেদের বিষয়ে তথ্য দেওয়ার বিনিময়ে টাকা দেবেন না। তবে শিশুটি যদি শ্রমজীবী হয়, তার সময়ের ক্ষতিপূরণ হিসেবে সংগত পরিমাণ টাকা দেওয়ার কথা ভাববেন। এ ছাড়া, কোনো বিশেষ দুর্যোগ-দুর্বিপাক পরিস্থিতিতে বা কোনো সহায়সম্বলহীন শিশুর কল্যাণের জন্য আপনি টাকা দিতে চাইতে পারেন। তবে নিশ্চিত হয়ে নেবেন যে সেটা সেজন্যই দেওয়া হচ্ছে।

✓ **স্কুলে কথা বলা**—স্কুলে কোনো শিশুর সঙ্গে কথা বলতে হলে অবশ্যই প্রধান শিক্ষকের অনুমতি নেবেন। এ ছাড়া, ক্লাসের সময়ের বাইরে কথা বলতে চেষ্টা করবেন।

✓ **টেলিফোনে বা ই-মেইলে নয়**—টেলিফোনে বা ই-মেইলে কোনো শিশুর সাক্ষাৎকার না নিয়ে সামনাসামনি কথা বলার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন। কখনো যদি উপায়ান্তর না থাকে তখন সবিশেষ সতর্ক থাকবেন।

✓ **সঠিক প্রেক্ষাপটে**—শিশুসংক্রান্ত বিবরণ, তার বক্তব্য, ছবি সব সময় যথাযথ প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করুন।

✓ **পরে খোঁজ নেওয়া**—আপনার ফোন নম্বর ও যোগাযোগের ঠিকানা দিয়ে আসবেন। সমস্যা হলে যোগাযোগ করতে বলবেন। স্পর্শকাতর বা ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্রে নিজে খোঁজ নেবেন, যোগাযোগ রাখবেন।

✓ **আইন-আদালত**—অপরাধ-নির্যাতনের ক্ষেত্রে বিশেষত ভিকটিম বা সাক্ষীদের সাক্ষাৎকার নেওয়ায় আইনগত বা আদালতের বাধা থাকতে পারে। ভালো করে বুঝে নেবেন। *(দেখুন, অধ্যায় ৫-এর খ. অংশ)*

— যাদের অবস্থান বিশেষভাবে নাজুক বা অরক্ষিত

উপস্থাপন বা প্রতিফলনের ঝুঁকি, সংবেদনশীলতা ও দায়িত্ব, পরিচয়ের গোপনীয়তাসহ সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা, সাক্ষাৎকারে সতর্কতার মাত্রা—সবই বিশেষ বেড়ে যায় শিশুর পরিস্থিতি বা অবস্থান বিশেষভাবে নাজুক হলে। একই সঙ্গে, সংবাদে এদের উপেক্ষা না করা এবং ঘটনাগুলো যথাযথভাবে রিপোর্ট করার দাবিও বড় হয়ে আসে। এ রকম কয়েকটি ক্ষেত্র :

✓ **যৌন নিপীড়নের শিকার শিশু**—রিপোর্ট করতে গিয়ে শিশুটির ক্ষতি করার অনেকগুলো ঝুঁকি থাকে। এরা আপনার বিশেষ সমমর্মিতা ও বিবেচনা দাবি করে।

- এমন শিশুর তাৎক্ষণিক মানসিক বিপর্যস্ততার সঙ্গে যুক্ত হয় দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ও সামাজিক কলঙ্কের মাত্রা। সামাজিক নিরাপত্তার ঝুঁকিও থাকে। রিপোর্টে কখনোই তাকে কোনোভাবে শনাক্ত করবেন না।

- আইনগত প্রক্রিয়ার দিকে নজর রাখবেন। ভয়ভীতি দেখানো, মামলা না করতে চাপ দেওয়া, ধর্ষণের দৃশ্য ভিডিও করে বাজারে ছাড়াসহ কোনো মানসিক নির্যাতন হচ্ছে

কি না, সে খোঁজ করবেন। সামাজিক বিচার-সালিস বা ফতোয়ার মাধ্যমে শিশুটির অধিকতর হেনস্তা হচ্ছে কি না, বা দায়ী ব্যক্তিকে আইনের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেওয়া হচ্ছে কি না, সেটার নজরদারি চাই। আইনের মানুষজনও এভাবে মামলাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে।

- পরিবারে ঘনিষ্ঠজনের হাতে শিশুর যৌন নিপীড়ন এমন একটি সমস্যা, যার সমাধানের জন্য বিষয়গুলো মানুষকে জানানো দরকার। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে শিশুর মানসিক ও সামাজিক আঘাত পাওয়ার আশঙ্কা প্রবল। সুতরাং খুবই সতর্কতা দরকার হবে। শিশুর পরিচিতি প্রকাশ পেয়ে যেতে পারে বুঝলে, এটা যে নিকটাত্মীয় কারও দ্বারা নির্যাতন (ইনসেস্ট), সে তথ্যটি এবং/অথবা নির্যাতনকারীর সঙ্গে শিশুটির সম্পর্ক রিপোর্টে উহ্য রাখবেন।

- এর আগে যেমনটা বলেছি, যৌন নির্যাতনের শিকার শিশু যখন মারা যায় তখনো প্রতিবেদনে তাকে শনাক্ত করা যায় না।

✓ **আইনপরিপন্থী কাজে জড়িত শিশু**—এদের সম্পর্কে খবর করতে বিশেষ সতর্কতা ও যত্ন দরকার। এরাও আপনার মমতা ও বিবেচনা দাবি করে।

- সামাজিক কলঙ্ক ও ধিক্কারের ঝুঁকি তাদের অনেক বড়। রিপোর্টে তাদের শনাক্ত করবেন না। এমন কোনো শিশুর মৃত্যুর পরও সে কলঙ্ক তার সঙ্গে জড়িত অন্য শিশু বা গোষ্ঠী ধরে শিশুদের সম্পর্কে অন্যায্য বিরূপ ধারণা জিইয়ে রাখতে পারে।

- এসব পরিস্থিতি কিন্তু আপনাকে অনেকগুলো দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলতে পারে। আইনপরিপন্থী কাজে জড়িয়ে পড়া শিশু সম্পর্কে অনেক সময় আপনার নিজের দোষারোপের মনোভাব থাকতে পারে। জনমত তার শাস্তি চাইতে পারে। তার অপরাধের শিকারও যদি কোনো শিশু হয় তখন সে পক্ষের ন্যায়বিচারের দাবি চাপ সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষভাবে দ্বিধা আসতে পারে কিশোরবয়সীরা যখন শিশু বা কিশোরবয়সী কাউকে যৌন নিপীড়ন করে বা হত্যা করে।

- প্রথম দ্বিধাদ্বন্দ্ব আসে শিশুটিকে শনাক্ত করার প্রশ্নে। কিন্তু এদের শনাক্ত করা যায় না, 'অপরাধী'ও বলা যায় না। সেটা গুরুতর অন্যায্য হয়। প্রথমত, এমন কাজের জন্য শিশুকে একক দায়িত্ব দেওয়া অন্যায্য। তার পরিবেশের দায় থাকে, বড় কেউ তাকে ব্যবহার করে। দোষের তকমা এঁটে দিলে তাকে হয়তো আরও বেশি করে অপরাধের জগতে ঠেলে দেওয়া হবে। দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে সমাজে তাকে ফিরিয়ে আনার পথ বন্ধ হবে। সমাজের ঝুঁকি বাড়বে। তা ছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে শিশুটি দায় থেকে অব্যাহতি পেতে পারে। তখন আপনার শনাক্তকরণ আরও অন্যায্য হয়ে পড়বে।

- আইনে এমন আচরণে জড়িয়ে পড়া শিশুর সাজা হয় না, সংশোধনের ব্যবস্থা করা হয়। এর বিচার এবং এর প্রতি পুলিশসহ কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিদের আচরণ শিশুর কল্যাণ ও সুরক্ষার আইন মেনে হচ্ছে কি না সেদিকে আপনাকে নজর রাখতে হবে।

- রিপোর্টে পরিবেশগত বা অন্য কারণগুলো তুলে ধরতে মনোযোগী হবেন; কারা শিশুটিকে এমন কাজে জড়িত করছে তা অনুস্কান করবেন।

- একই সঙ্গে রিপোর্টে বা তার সঙ্গে কথা বলার সময় তার কাজের গুরুত্বকে কিন্তু আপনি কমিয়ে দেখতে পারেন না, বিশেষত সে কাজের ফল যদি গুরুতর হয়। শিশুর সর্বোত্তম কল্যাণ হচ্ছে লক্ষ্য। তার কাজের ক্ষতিকর দিকটি তুচ্ছ করে বা আমলে না নিয়ে দেখলে/দেখালে তারই ক্ষতি হবে। তবে আপনি দোষারোপ, ধিক্কার বা মূল্যায়ন থেকে মুক্ত থাকবেন।

ওপরে বর্ণিত দুটি পরিস্থিতির রিপোর্টেই সতর্ক থাকবেন, যেন আগাম বিচার করা না হয়ে যায়। এসব ঘটনার সংবাদে দোষারোপের সুর বা অবস্থান নিলে সংবাদমাধ্যমেই অভিযুক্তের বিচার বা মিডিয়া ট্রায়াল হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। তেমন হলে সেটা জড়িত শিশুটির সুবিবেচিত বিচার পাওয়ায় বাধা সৃষ্টি করবে। পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আইন বিষয়ে এবং সংবেদনশীলতা প্রসঙ্গে কিছু রিপোর্টের উদাহরণ ধরে জরুরি আলোচনা ও পরামর্শ রয়েছে। শিশুদের কিছু মতামতও সে অধ্যায়ে পাবেন। এ ছাড়া, সেখানে 'ধর্ষণের শিকার ও অপরাধমূলক কাজে জড়িত/অভিযুক্ত শিশু' শীর্ষক বক্সটিতে চুম্বক কিছু পরামর্শ পাবেন।

✓ **অন্যান্য নাজুক পরিস্থিতি**—সুরক্ষা প্রসঙ্গে এমন অনেকগুলো ক্ষেত্রের কথা ইতিমধ্যে এসে গেছে। যেকোনো সংঘাত-সংঘর্ষ, যুদ্ধাবস্থা, জাতিগত বা সাম্প্রদায়িক বিরোধ-উত্তেজনা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, উদ্বাস্তু বা শরণার্থী-পরিস্থিতিতে যে শিশুরা আছে তাদের সম্পর্কে প্রতিবেদন করার সময় তার সব রকম ঝুঁকির কথা মাথায় রাখবেন। একই রকম বিবেচনার দাবিদার যেকোনো নির্যাতন বা সহিংসতার শিকার শিশু, পাচার ও বিক্রি হওয়া শিশু, অপহরণ হওয়া শিশু, পথশিশু, শিশুসৈন্য, শিশু যৌনকর্মী, যৌনকর্মীর শিশুসন্তান, এইচআইভি/এইড্‌স আক্রান্ত শিশু বা যাদের বাবা-মার এ সংক্রমণ আছে তারা, শারীরিক বা বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী, শিশু গৃহকর্মীসহ সব রকম ঝুঁকিপূর্ণ এবং শোষণমূলক শ্রমে নিয়োজিত শিশু এবং অতিদরিদ্র ও সামাজিকভাবে প্রান্তিক অবস্থানের শিশুরা।
ছবির বেলায় বাড়তি সতর্কতা চাই।

—সংবাদে ফায়দা ওঠানোর জন্য শিশুকে ব্যবহার করা

সতর্ক থাকুন, কখনো সংবাদমাধ্যম নিজেও কিন্তু খবরের কাটতির স্বার্থে শিশুকে ব্যবহার করতে পারে।

✓ **চটকদার করা, যৌন আবেদন**—শিশুকেন্দ্রিক খবর রগরগে চটকদারিত্বে ঝুঁকলে এমনটা ঘটে। কখনো বিবরণে ও ছবিতে শিশুকে যৌন আবেদনের উপায় হিসেবে উপস্থাপিত করা হতে পারে। যৌন নির্যাতনের খবরে এমনটা করার নজির আছে।

✓ **আবেগ, 'সহানুভূতি'**—অনেক সময় শিশুর মর্যাদা, নিরাপত্তা বা স্বার্থের দিকে নজর না রেখে তার আবেদনকে নিছক মানুষের আবেগ জাগানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা বড় দুর্ঘটনার বিবরণে-ছবিতে এমনটা দেখা যায়। কখনো এটা করা হয় সহানুভূতির ছদ্মবেশে। *(দেখুন, অধ্যায় ৫-এর গ. অংশ)*

নৈতিকতার অনুষঙ্গী দ্বিধাদ্বন্দ্ব

এ পর্যন্ত আলোচনায় এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে নীতি-নৈতিকতার প্রশ্নে দ্বিধাদ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। আপনাকে ভালো ও ক্ষতিকর ফলাফলের মধ্যে বিচার করে প্রতিনিয়ত ছোট বা বড় সিদ্ধান্ত নিতে হয়, সংশ্লিষ্ট মানুষজনের অযাচিত ক্ষতি যথাসম্ভব কমানোর চেষ্টা করতে হয়। ঘটনায় যখন শিশু জড়িত থাকে অথবা বিষয়ের কোনো দিক তুলে ধরলে সংবাদের শিশু শ্রোতা-দর্শক-পাঠকের অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে, তখন এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের মীমাংসায় সাবধানতার প্রয়োজনীয়তা অনেক বড় হয়ে আসে। সংবাদ প্রকাশের তাড়াহুড়োর মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাজটি কঠিন। নিজের প্রতিটি দ্বিধাদ্বন্দ্বের অভিজ্ঞতা মনে রাখলে এবং সম্ভাব্য দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে ভাবনাচিন্তার চর্চা থাকলে আপনার সুবিধা হবে। **আর মনে রাখবেন, সাংবাদিকতার নৈতিকতা বলে—চরম কোনো ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি না হলে—শিশুর স্বার্থ সবার ওপরে।** (*দেখুন, অধ্যায় ৬*)

শিশুর প্রেক্ষাপটে সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতার এ বিষয়গুলো মাথায় নিয়ে আমরা এবার বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জরুরি কিছু দিকে নজর দেব।

অধ্যায় ৫

বাংলাদেশে সাংবাদিকতা ও শিশু

যে ভিত্তি-সমীক্ষাটি (এমআরডিআই/ইউনিসেফ, ২০০৯) এ সহায়িকা গোছাতে সাহায্য করেছে, সেটি বলছে যে শিশু সম্পর্কে এবং শিশুর জন্য নৈতিক হতে হলে বাংলাদেশের সাংবাদিকতাকে কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে :

— শিশুকে, শিশুর বক্তব্য-মতামতকে এবং তার তথ্য পাওয়ার অধিকারকে আরও অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

— শিশু জড়িত আছে এমন এবং শিশুর জন্য জরুরি ও শিশুর আগ্রহ আছে এমন ঘটনা, প্রবণতা বা বিষয়ে রিপোর্টের সংখ্যা অনেক বাড়াতে হবে।

— সংবাদ হিসেবে বিবেচ্য বিষয়ের তালিকা ও আওতা বড় করতে হবে। শিশুর বাস্তবতা ও প্রয়োজন/চাহিদার পুরো বৃত্তকে তুলে ধরতে মনোযোগী হতে হবে।

— ঘটনাকেন্দ্রিক রিপোর্ট করার চলতি প্রবণতার বদলে উদ্যোগী হয়ে গভীরে গিয়ে রিপোর্ট করা বাড়াতে হবে। ঘটনা ঘটার জন্য বসে না থেকে জরুরি প্রবণতা ও বিষয়গুলো অনুসন্ধান করে রিপোর্ট করতে হবে। সেগুলোর প্রতি সময় থাকতে সমাজের মানুষ ও নীতিনির্ধারকদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে।

— ঘটনা বা বিষয়কে একবার রিপোর্ট করে ভুলে যাওয়ার চলতি প্রবণতার বদলে শিশুর জন্য জরুরি বিষয়গুলোকে লেগে থেকে অনুসরণ করতে হবে, অর্থাৎ প্রয়োজনীয় ফলো-আপ রিপোর্ট করতে হবে।

— রিপোর্টে তথ্যের সঠিকত্ব ও সত্যতার প্রতি যত্ন লাগবে; তথ্যের সূত্র ও উৎস নির্ভরযোগ্য ও জোরালো হওয়ার ব্যাপারে মনোযোগ চাই; রিপোর্টে তথ্যের সংলগ্নতা বা সামঞ্জস্যের দিকে নজর লাগবে। বিশেষ নজর চাই পূর্ণাঙ্গ সত্য ও জরুরি সব দিকের তথ্য আনার প্রতিও।

— মৃতদেহের ছবি না দেখাতে সতর্ক থাকতে হবে। রক্তাক্ত, বীভৎস ছবি বা বীভৎস নিষ্ঠুরতার বিস্তারিত বিবরণ না দিতে সতর্ক থাকতে হবে। সহিংসতা ও সমাজবিরোধী কাজের বিশদ বিবরণ অথবা এগুলোর প্রক্রিয়া পদ্ধতির বিস্তারিত বর্ণনা না দিতে সতর্ক থাকতে হবে।

— শিশু জড়িত আছে, এমন ঘটনাসহ যেকোনো ঘটনারই চটকদার বা চাঞ্চল্যকর (সেনসেশনাল) উপস্থাপন না করতে সতর্ক থাকতে হবে। স্পর্শকাতর ঘটনা বা বিষয়ে এবং শিশুর ভাবমূর্তি বা ইমেজ প্রতিফলনের ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে।

— সংবাদের ঘটনায় জড়িত শিশুদের সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত করতে সচেষ্ট থাকতে হবে। যেখানে প্রয়োজন সেখানে তাদের নাম-পরিচিতির নিরঙ্কুশ ও কার্যকর গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে হবে। তাদের নিরাপত্তা ও স্বস্তির ব্যাপারে যত্নশীল হতে হবে।

— সংবাদের ঘটনায় জড়িত শিশুদের প্রতি ভাষা ও বিবরণে আরও সংবেদনশীল হতে হবে; বিশেষণের ব্যবহার, বিশেষত মূল্যায়নধর্মী শব্দ, বাদ দিতে হবে।

— সংবাদের ঘটনা বা বিষয় এবং জড়িত শিশু সম্পর্কে কোনো রকম বৈষম্য, ছাঁচে-ঢালা ধারণা উপস্থাপন ও সাধারণীকরণ না করতে সতর্ক থাকতে হবে। শিশুর ভাবমূর্তি বা ইমেজ প্রতিফলনে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে, যেন সেটা কোনো বৈষম্য বা ছাঁচে-ঢালা ধারণা তৈরি না করে।

— জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদসহ শিশুসংক্রান্ত বিভিন্ন আইন জানতে হবে; সেগুলো এবং সেগুলোর প্রয়োগের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে রিপোর্ট করতে হবে; প্রাসঙ্গিক রিপোর্টে সেগুলোর বিধিবিধান মানতে হবে।

এ ছাড়া, আপনার জন্য বিভিন্ন নৈতিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব মোকাবিলা করার দক্ষতা বাড়ানো এবং নিজস্ব একটি নৈতিকতার বিধান বা আচরণবিধি তৈরি ও সেটা অনুসরণ করা জরুরি হবে। ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে এ দুটি বিষয়ে নজর দেব। আপাতত চলতি অধ্যায়ে আমরা ওপরের প্রসঙ্গগুলোয় কিছু করণীয় তলিয়ে দেখব।

ক. খবরের সংখ্যা, বিষয়, আওতা এবং মান ও গভীরতা বাড়ানো

শিশু সম্পর্কে এবং শিশুর জন্য জরুরি বিষয়ে খবর বাড়ানো এবং সে খবর ভালোভাবে করা নৈতিকতার বড় দাবি।

কারণ? ভবিষ্যৎ! শিশু ভবিষ্যতের জনসমাজের প্রতিনিধি। শিশুকে উপযুক্ত ও দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে হবে। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে আপনাকে শিশুর স্বার্থের প্রতি মনোযোগী হতে হবে।

শিশুরা আপনার মনোযোগের বেশি দাবিদার, কিন্তু তারাই বঞ্চিত হচ্ছে। ২০০৯ সালে সমীক্ষাধীন তিন মাসে বাংলাদেশের প্রধান ১২টি জাতীয় দৈনিক এবং তিনটি টিভি চ্যানেলে খবরের ৩ শতাংশ বা তারও কম ভাগে শিশু উপস্থিত ছিল। (এমআরডিআই/ইউনিসেফ, ২০০৯)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

অনুচ্ছেদ ২৮ (১)—কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

অনুচ্ছেদ ২৮ (৪)—নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

একনজরে চলতি প্রবণতা

সমীক্ষায় দেখা গেছে :

— শিশুকে জড়িয়ে বড় কোনো ঘটনা ঘটলে সেগুলো সংবাদে আসছে। দিনের যেসব রুটিন ঘটনা সহজে চোখে পড়ে বা যেগুলো অনুষ্ঠান করে সাংবাদিকদের জানান দিয়ে ঘটে সেগুলো রিপোর্ট করা হচ্ছে। খবরগুলোর অর্ধেকই ছোট ছোট মামুলি রিপোর্ট। এ ছাড়া, রিপোর্টারেরা কখনো কখনো শিশুর প্রতি এমন অন্যায়-অনিয়মের দিকে আলোকপাত করেছেন বা বিরল আশার চিত্রের কথা মানুষকে জানিয়েছেন, যা সাধারণভাবে চোখের আড়ালে রয়ে যেত। কিন্তু এটা বিক্ষিপ্ত চর্চা। শিশুর বাস্তবতার অনেক জরুরি ঘটনা হয়তো চোখের আড়ালেই রয়ে যাচ্ছে।

— টুকরো টুকরো হঠাৎ দেখা ছাড়া সমাজে নানা পরিস্থিতিতে থাকা শিশুদের জীবনে যেসব ঘটনা ঘটে, যে বিপদ আসে, সেগুলো খবরে উঠে আসছে না। শিশুর অধিকার ও ভালো থাকার জন্য জরুরি অনেক বিষয়ে রিপোর্ট করা হচ্ছে না বা খুব কম করা হচ্ছে। সংবাদপত্রে বেশি আসছে নানা ধরনের দুর্ঘটনায় শিশুর মৃত্যুর ছোট্ট খবর, শিশু হত্যা, বা অন্য কোনো খারাপ খবর। টিভির খবরে আবার সেমিনার, আলোচনা বা অনুষ্ঠানের ভিড়।

— যেসব রিপোর্ট হচ্ছে, তার বেশিরভাগই অগভীর ও সাদামাটা। জরুরি অনেক ঘটনা পরে কী হচ্ছে তা অথবা প্রবণতা অনুসরণ করা হচ্ছে না। গভীরে গিয়ে বিষয়গুলো দেখা হচ্ছে না। সমীক্ষায় দেখা সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেলের মোট শিশুবিষয়ক খবরের মাত্র ১৩ থেকে ১৪ ভাগ ছিল গভীরতাধর্মী রিপোর্ট। এ ছাড়া, রিপোর্ট হচ্ছে কোনো ঘটনা ঘটার পর। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে বা প্রবণতা অনুসন্ধান করে রিপোর্ট করা হচ্ছে খুব কম। হলে তা হয়তো অনেক বিপত্তির/সমস্যার আগাম আভাস দিতে পারত।

— অনেক রিপোর্টে বিশ্বাসযোগ্যতা ও সুস্পষ্টতায় কিছু না কিছু ত্রুটি দেখা গেছে।

— শিশুবিষয়ক সংবাদ করার চলতি প্রবণতা বলছে রিপোর্টারের উদ্যম বা দক্ষতার ঘাটতি যেমন থাকতে পারে, তেমনি সম্পাদকীয় বা নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে গুরুত্ব না দেওয়ার সমস্যা আছে। সেটা আরও বোঝা যায় সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় দেখলে। সমীক্ষাধীন সময়ে ১২টি পত্রিকায় প্রকাশিত মোট সম্পাদকীয় সংখ্যার মাত্র শূন্য দশমিক ৫৫ ভাগ (.৫৫%) শিশুর প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিল।

— অন্যদিকে, খবরে শিশুর মতামত বা চিন্তাভাবনার প্রতিফলন খুব কম মেলে। শিশুসংক্রান্ত খবরেও অনেক সময়ই শিশুর সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে না।

আপনার করণীয়

মানুষকে চলতি ঘটনা সম্পর্কে অবহিত রাখতে হবে। দিনের ঘটনার রিপোর্ট রেকর্ড হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কেবল দিনের রুটিন ঘটনার ওপর নির্ভর করলে শিশুবিষয়ক খবর বা খবরের বিষয় বাড়ানো যাবে না। এ ছাড়া, বিচ্ছিন্ন এসব ছোট ছোট রিপোর্ট বাস্তব বা ঘটনাপ্রবাহ বুঝতে সাহায্য করে না। এগুলো শিশুর কল্যাণে তেমন সহায়ক হবে না। অন্যদিকে বড় ঘটনা, স্পষ্টত

নজরকাড়া ঘটনা, রোজ ঘটে না। ফলে শিশুবিষয়ক রিপোর্ট সংবাদমাধ্যমে যথার্থ গুরুত্ব পাওয়ার সুযোগও থাকবে না।

- ✓ খবরের সংখ্যা বাড়া, খবরের ধরন পাল্টানো এবং বিষয়ের গণ্ডি বাড়ানো—একটা আরেকটার ওপর নির্ভরশীল। আপনি লেগে থেকে গভীরে গিয়ে প্রবণতা তুলে ধরে বিষয়ভিত্তিক রিপোর্ট করলে খবরের সংখ্যা, বিষয়, গুরুত্ব সবই বাড়বে। আবার দিনের ঘটনা দেখার গণ্ডি বাড়ানো, ভালোভাবে সে রিপোর্টগুলো করা, ঘটনার গতিবিধি অনুসরণ করা এবং বিভিন্ন ঘটনায় শিশুর স্বার্থের সম্পৃক্ততা খোঁজা জরুরি হবে।
- ✓ সুতরাং আমরা ভিন্ন ধরনের সাংবাদিকতার কথা বলছি। সে কাজে নিজেকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। তেমনি পত্রিকার নীতিনির্ধারকদেরও রিপোর্টারকে এ ধরনের কাজ করার জন্য পর্যাপ্ত সময়, সুযোগ ও ঘোরাঘুরির খরচ দিতে হবে। রিপোর্টার রিপোর্ট করে কারও রোষে পড়লে তাঁকে সমর্থন-সুরক্ষা দিতে হবে।

  আপনাকে ভালো কাজ করে এর সুফল দেখিয়ে দিয়ে তেমন সুযোগ আদায় করে নিতে সচেষ্ট হতে হবে।

— **গভীরতাধর্মী রিপোর্ট করা :** গভীরতাধর্মী রিপোর্টকে আমরা চলতি কথায় 'স্পেশাল রিপোর্ট' নামে চিনি। আপনাকে স্পেশাল রিপোর্ট করায় মনোযোগী হতে হবে। আপনি ঘটনা ঘটার জন্য বসে থাকবেন না। আবার, দিনের ঘটনার সুতো ধরে সে রকম খবরে পৌঁছাতে হবে।

- কোনো বিশেষ একটি ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় শিশু মারা যাওয়ার অভিযোগ উঠলে রিপোর্ট করা হয়। আপনি কিন্তু তারও আগে থেকে শিশুর জন্য তৈরি ওষুধের মান বা মান নিয়ন্ত্রণ পরিস্থিতির ওপর রিপোর্ট করতে পারেন। অথবা ঘটনা ঘটার পরও লেগে থেকে সার্বিক বিষয়টির খোঁজ করে যেতে পারেন।
- আপনি ঘন ঘন দুর্ঘটনায় শিশুমৃত্যুর রিপোর্ট করেন। বিভিন্ন ধরনের প্রবণতাগুলো তলিয়ে দেখে গভীরতাধর্মী প্রতিবেদন করতে পারেন—কী দুর্ঘটনায়, কেন, কীভাবে শিশু বেশি মারা যাচ্ছে, কী হলে এটা বন্ধ হতে পারত বা কমত।

এ ধরনের রিপোর্ট শিশুর কল্যাণে জরুরি ভূমিকা রাখতে পারবে। শিশুর জন্য জরুরি বিষয়গুলো নিয়ে একেক দিকে মনোনিবেশ করে বা বিষয়ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট থিম ধরে রিপোর্ট করবেন। তিনটি কথা মনে রাখুন :

- ✓ **প্রেক্ষাপট (ব্যাকগ্রাউন্ড ও কনটেক্সট)**—ঠিক আগের ঘটনাগুলো দেখবেন; কোন প্রেক্ষাপটে ঘটনাটি ঘটছে তা বুঝবেন;
- ✓ **কারণ**—তলিয়ে পেছনের কারণগুলো, আড়ালে থাকা ঘটনা/সত্য অনুসন্ধান করবেন;
- ✓ **তাৎপর্য**—শিশুর জন্য ঘটনা বা বিষয়টির তাৎপর্য কী, এর ফলে কী ঘটতে পারে বা কী না ঘটতে পারে তা বুঝবেন।

এসব কিছু বুঝিয়ে পশ্চাৎপটের প্রয়োজনীয় তথ্য জুগিয়ে সঠিক প্রেক্ষাপটে বিষয়টি তথ্য-

প্রমাণ-উদাহরণসহ তুলে ধরবেন। শিশুর জন্য শিক্ষণীয় দিক তুলে ধরতে মনোযোগী হবেন। ভালোভাবে করতে পারলে সংবাদমাধ্যম এগুলোকে গুরুত্বও দেবে, বড় শিরোনামে জায়গা দিয়ে প্রকাশ করবে।

ঘটনা বা বিষয়ের এ তিনটি দিকে খোঁজ করলে রিপোর্টে গভীরতা আসবে, প্রবণতা স্পষ্ট হবে, ধারাবাহিকতা বোঝা যাবে। কেবল বিশেষ রিপোর্টে নয়, দিনের ঘটনার সাদামাটা প্রতিবেদনেও এ তিনটি দিকে মনোযোগী হবেন। রিপোর্টের চেহারা পাল্টে যাবে।

— **একটি মূলকথা :** আপনাকে উদ্যমী হয়ে কাজ করতে হবে। এই অংশের শেষে প্রতিবেদন পরিকল্পনা প্রসঙ্গে কিছু পরামর্শ থাকছে।

— **ফিচার করা :** আপনাকে ফিচার করায় মনোযোগী হতে হবে। এখন শিশুকেন্দ্রিক ফিচার হচ্ছে কদাচিৎ। গভীরতাধর্মী রিপোর্টের মতো ফিচারও কোনো বিষয়ের ভেতরে ঢুকতে পারে। ফিচারে মানবিক প্রেক্ষাপট প্রধান হয়ে আসে। সেটা এর একটি বড় সুবিধা।

— **নিউজপেগ ও দিবস ব্যবহার করা :** দিনের ঘটনার বাইরে রিপোর্ট বা ফিচার করার জন্য যথোপযুক্ত উপলক্ষ খুঁজতে হবে। ইংরেজিতে একে বলে নিউজপেগ বা পেগ। দেয়ালের পেরেকে যেমন ছবিটা লটকিয়ে রাখা যায়, তেমনি উপযুক্ত উপলক্ষের সঙ্গে মিলিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন বা ফিচার করলে সেটা প্রাসঙ্গিক ও গ্রহণযোগ্য হয়। বছরজুড়ে নানা দিবস আছে। অনেকগুলোয় শিশু বিষয়ে রিপোর্ট করা হয়; আরও অনেকগুলোয় করার সুযোগ আছে। এসব দিবসে গৎবাঁধা রিপোর্ট না করে সুপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরার সুযোগ খুঁজতে হবে। কোনো আন্তর্জাতিক বা স্থানীয় সম্মেলন, বড় অনুষ্ঠান, চলতি কোনো ঘটনা–সব উপলক্ষের সঙ্গে মিলিয়ে গভীরতাধর্মী বিশেষ প্রতিবেদন ও ফিচার পরিকল্পনা করবেন।

— **সব পাতার সদ্ব্যবহার :** কেবল খবরের পাতাগুলো/বুলেটিন নয়, বিভিন্ন বিশেষ পাতা, ক্রোড়পত্র বা সাপ্লিমেন্টে/বিশেষ অনুষ্ঠানে শিশুর জন্য জরুরি বিষয়ে খবর করার সুযোগ খুঁজবেন।

— **বিষয় পাওয়া :** সাংবাদিকের নৈতিকতা বলে, দুর্বলের প্রতি বেশি মনোযোগ দিতে হবে। যে নিজের জন্য কিছু বলতে পারে না, তার কথা বেশি বলতে হবে। সমাজের এমন অংশগুলো মধ্যে শিশুরাই সবচেয়ে বড়।

- ✓ ২০০১ সালের আদমশুমারিতে বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশেরই বয়স ছিল ১৮-এর নিচে। এ দেশের জনসংখ্যায় অল্পবয়সীদের বেশি থাকার প্রবণতা রয়েছে। এত বড় জনগোষ্ঠী সম্পর্কে ভালো রিপোর্ট করার অসংখ্য বিষয় থাকবে। ভেবে দেখুন, কী নিয়ে আপনি রিপোর্ট করছেন আর কী উপেক্ষা করে যাচ্ছেন। *(দেখুন, পরিশিষ্ট ১ : বাংলাদেশে শিশুদের জন্য জরুরি বিষয়ের তালিকা)*

- ✓ একবার রিপোর্ট করে থেমে না গিয়ে লেগে থেকে ঘটনা অনুসরণ করলে অনেক ভালো ভালো বিষয়ের হদিস পাবেন।

✓ শিশুদের মধ্যে যারা বেশি কঠিন অবস্থায় আছে, যাদের সমস্যা-বঞ্চনা বেশি, তাদের কথা আপনাকে বেশি বলতে হবে। নির্যাতন-শোষণের খবর চাই।

✓ কিছু বিষয় আমরা হয়তো চোখেই দেখি না। শিশুকে স্কুলে শিক্ষক মারলে সংস্কৃতিগতভাবে আমরা সেটা গর্হিত কাজ মনে করি না। ঘটনাটি আকছার ঘটে, কিন্তু প্রতিবেদন হয় কদাচিৎ। এভাবে কোনো বিষয়কে ভুলে যাওয়া চলবে না।

✓ শিশু অধিকারের সবগুলো বিষয় নিয়ে রিপোর্ট করা চাই। জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে বলা বিষয়গুলো নিয়ে এবং বাংলাদেশে এর বাস্তবায়নের পরিস্থিতি নিয়ে খতিয়ে অনুসন্ধানী, গভীরতামূলক রিপোর্ট করা দরকার। শিশুসংক্রান্ত জাতীয় আইনগুলো থেকেও রিপোর্টের বিষয় পাবেন। *(দেখুন, চলতি অধ্যায়ের খ. অংশ)*

এ ছাড়া দেশের প্রাসঙ্গিক নীতি/পরিকল্পনা/কার্যক্রম থেকে বিষয়ের পাত্তা পাবেন : জাতীয় শিশু নীতি, ১৯৯৪; শিশুশ্রম নিরসনের জাতীয় নীতি, ২০০৮ (ন্যাশনাল চাইল্ড লেবার এলিমিনেশন পলিসি); শিশু বিষয়ে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা; নারী ও শিশু উন্নয়ন জাতীয় পরিষদের কর্মকাণ্ড। সবচেয়ে খারাপ শিশুশ্রম বিষয়ে আইএলও সনদ এবং দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহায়তা সংস্থা—সার্কের নারী-শিশু পাচার প্রতিরোধসংক্রান্ত সনদের মতো অন্যান্য আন্তর্জাতিক সনদ/চুক্তিগুলো সম্পর্কে ধারণাও কাজে লাগবে।

✓ নানা অবস্থার শিশুদের সঙ্গে নিয়মিত কথা বলুন, তাদের পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখুন। তাদের প্রয়োজন ও আগ্রহ সম্পর্কে খোঁজ করুন—কী তাদের সমস্যা, কী তারা চায়, কিসে গুরুত্ব দেয়। এভাবে আপনি অনেক সমস্যা সম্পর্কে আগাম রিপোর্ট করে সেটা প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারেন। শিশুর মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে ভালো রিপোর্ট হতে পারে। যেমন ধরুন, সমীক্ষার সময়ে কোনো কোনো সাংবাদিক বলেছেন যে ক্ষেত্রবিশেষে শ্রোতা-দর্শক-পাঠক রক্তারক্তি সহিংসতা বা মৃতদেহের ছবি দেখতে চান। এটা যাচাইসাপেক্ষ। আপনি শিশুদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, এমন ছবি দেখলে তাদের কেমন লাগে। তাদের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরে ভালো একটি রিপোর্ট হতে পারে। *(এ অধ্যায়ের শেষে দেখুন, 'শিশুদের চোখে সংবাদ'।)*

— **ক্ষেত্র বাছাই করে মনোযোগ :** আগামী এক-দুই বছর নিয়মিত রিপোর্ট করার জন্য শিশুসংক্রান্ত বিষয়ের একটি বা দুটি ক্ষেত্র বেছে নিন। সেগুলো নিয়ে পড়াশোনা করুন, হালনাগাদ খোঁজ রাখুন এবং শিশুদের সঙ্গে ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ-কর্মকর্তা-এনজিও প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ করুন। বিষয়টি আপনার নখদর্পণে থাকুক। গভীরতাধর্মী রিপোর্ট বা ফিচার করতে পারবেন, প্রাসঙ্গিক দিনের ঘটনার রিপোর্টও চট করে ভালোভাবে করতে পারবেন।

> "জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণা অনুযায়ী প্রতিটি শিশুর প্রাপ্য হচ্ছে বিশেষ যত্ন ও সহায়তা।"
>
> "পৃথিবীর প্রতিটি দেশে এমন শিশু রয়েছে যারা খুবই কষ্টকর পরিবেশে বাস করছে এবং তাদের জন্য অবশ্যই বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন এ কথা মনে রাখতে হবে।"
>
> **জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের ভূমিকা থেকে**
> *(বাংলা অনুবাদ : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও ইউনিসেফ)*

— **বিট এবং সম্ভাব্য সব খবরে :** আলাদা করে শিশুর বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া জরুরি। সংবাদমাধ্যম যদি কোনো রিপোর্টারকে এর দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেয় বা বিট করে দেয় তাতে সুবিধা হবে। তবে সেটাই সব নয়। সংবাদের সাধারণ প্রবাহের মধ্যে শিশুর দাবিকে স্বীকার করতে হবে। এটা দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। বড়দের অনেক সিদ্ধান্ত বা কাজই শিশু ও শিশুর স্বার্থকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। কাজেই শিশুর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বা তার এক্তিয়ার হতে পারে, এমন বিষয়ের গণ্ডিটা অনেক বড়। যেকোনো বিষয়ে শিশুর স্বার্থ বা শিশুর সংশ্লিষ্টতা ভেবে দেখা দরকার :

- ✓ বেশিরভাগ সময় দেখা যায়, সমাজের অনেক বদলের ফলে শিশুরাই বেশি দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। দালানকোঠার দৌরাত্ম্যে শহর থেকে খেলার মাঠগুলো যখন হারিয়ে যায়, সেটা শিশুর বিকাশের বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে শিশুর পরিপ্রেক্ষিত ভেবে রিপোর্ট করতে হবে।

- ✓ সরকারের নীতি/পদক্ষেপ অথবা তার অভাব শিশুর ভালো থাকার ওপর বড় প্রভাব ফেলে। সরকার যদি প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার মান কমিয়ে দেয় সেটা সরাসরি শিশুদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়। রিপোর্টার যখন বাজেটের রিপোর্ট করছেন, তখনো শিশুর পরিপ্রেক্ষিত দেখা জরুরি। শিশুর পরিপ্রেক্ষিত থেকে সরকারের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, বিভিন্ন নীতি, কার্যক্রম এবং সক্রিয়তা বা নিষ্ক্রিয়তা, সফলতা বা ব্যর্থতা নজরে রেখে খতিয়ে দেখে প্রতিবেদন করবেন।

— **শিশুর কণ্ঠস্বরে নতুন মাত্রা :** যেসব ঘটনা বা বিষয়ে শিশুরা জড়িত আছে, সেগুলো শিশুর বক্তব্য বা চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ছাড়া পূর্ণাঙ্গ হবে না। এ ছাড়া, অন্যান্য বিষয়ে যেখানে প্রাসঙ্গিক সেখানে শিশুর বক্তব্য ও মতামত যুক্ত করুন। সঠিক প্রেক্ষাপটে শিশুর বক্তব্য রিপোর্টে নতুন মাত্রা আনবে, রিপোর্টকে আকর্ষণীয় ও বোধগম্য করবে।

— **রুটিন খবরে বাড়তি মাত্রা :** দিনের যেসব ঘটনায় শিশু জড়িত থাকে সেগুলোর রিপোর্টেও আপনি অল্প কথায় বাড়তি মাত্রা যোগ করতে পারেন। দু-এক বাক্যে ঘটনার চুম্বক প্রেক্ষাপট দিন। মানবিক দিক থেকে ঘটনাটি দেখুন। ছোট করে হলেও প্রয়োজনীয় কারণ ও তাৎপর্য

তুলে ধরতে চেষ্টা করুন। সর্বোপরি শিশুর বক্তব্য নিয়ে আসুন। এভাবে ঘটনাটি ভালো বোঝা যাবে।

- ✓ শিশু বিষয়ে সেমিনার, গোলটেবিল, সভা, বইয়ের মোড়ক উন্মোচন, বিভিন্ন অনুষ্ঠান—এজাতীয় রিপোর্ট আপনাকে অনেক করতে হয়। বাঁধা গৎ ছাড়িয়ে উঠতে চেষ্টা করুন। সংশ্লিষ্ট বিষয়টির গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আরও দু-চারটা মানুষের সঙ্গে কথা বলে, শিশুদের সঙ্গে কথা বলে ভালো রিপোর্ট দাঁড়াতে পারে।
- ✓ একইভাবে সংবাদ সম্মেলন, এমনকি একটা বিজ্ঞপ্তির ওপর কাজ করে ভালো প্রতিবেদন হতে পারে।

— **শিশুকে পাশ কাটিয়ে নয় :** সচেতনভাবে মনে না রাখলে শিশুকে ভুলে যাওয়া সহজ। শিশুশ্রম নিয়ে অনুষ্ঠানে মন্ত্রী যদি ১৯৭১-এর যুদ্ধাপরাধের বিচার নিয়ে কথা বলেন, তখন রিপোর্টে শিশু একেবারেই নেপথ্যে চলে যায়। মন্ত্রী এমন অন্য কোনো বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বললে সেটা নিয়ে বরং আলাদা করে রিপোর্ট তৈরি করার কথা ভাবতে পারেন। শিশুসংক্রান্ত যেকোনো প্রতিবেদনেই শিশুর উপস্থিতি নিশ্চিত করা দরকার। শিশুই যে খবরের কেন্দ্রে, বোঝা যাওয়া চাই।

— **সব দিকে নজর :** রিপোর্টের আওতা বাড়ানো এবং রিপোর্ট পূর্ণাঙ্গ করার জন্য যেকোনো ঘটনার সবগুলো দিক নিয়ে ভাবা দরকার। যেমন, যেকোনো নিপীড়ন-নির্যাতনের ঘটনার আইনি দিক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেদিকটি সব সময় খতিয়ে দেখা হচ্ছে না। এসব ঘটনায় মানসিক নির্যাতনের দিকও থাকে। রিপোর্টে সেদিক কমই উঠে আসছে। এ ছাড়া, শিশুর অধিকার লঙ্ঘনের জন্য কে দায়ী, কী করলে তার প্রতিকার সম্ভব, রিপোর্টে সে দিকনির্দেশনা চাই। এগুলো রিপোর্টে গভীরতা আনারই অংশ।

— **রিপোর্টের দৃষ্টিকোণ :** ঘটনা নেতিবাচক হলে রিপোর্টের দৃষ্টিকোণ বা অ্যাঙ্গেল নেতিবাচক হবে, আবার ইতিবাচক ঘটনায় অ্যাঙ্গেলও ইতিবাচক হবে। কিন্তু বিষয়টি খুঁটিয়ে ভাবার সুযোগ আছে। যেকোনো বিষয়েরই ভালো দিক, মন্দ দিক দুটোই থাকে। ঢালাও অ্যাঙ্গেল প্রায় সময়ই বাস্তবকে প্রতিফলিত করে না। সমস্যায় নজর রাখা যেমন জরুরি, তেমনি সমস্যার সমাধানের দিকে নজর দিয়ে অ্যাঙ্গেল গঠনমূলক হওয়ার প্রয়োজন আছে। আশার দিকগুলো খুঁজে দেখা দরকার। আবার, উল্টোটাও সত্য। ভালো ঘটনারও সমস্যার দিক থাকে। সেটা দেখলে দেখাটা সম্পূর্ণ হয়। রিপোর্টের ঝোঁক অসংগতভাবে একমুখী হচ্ছে কি না, সে ব্যাপারে সজাগ থাকুন।

— **ইতিবাচক ঘটনা ও সতর্কতা :** আপনি শিশু সম্পর্কে ভালো ঘটনা বা ইতিবাচক ঘটনা খুঁজতে সচেষ্ট থাকবেন। ইতিবাচক ঘটনা শিশুকে ও অন্যান্য পাঠককে অনুপ্রাণিত করবে; তার দাম অনেক। তবে বাস্তবের সঙ্গে ভারসাম্য থাকা চাই। বাস্তবে যেখানে সমস্যা অনেক, সেখানে কেবল ভালো ঘটনাগুলোর প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ঝোঁক দেবেন না। সমীক্ষায় দেখা গেছে সংবাদমাধ্যম, মূলত সংবাদপত্র, এসএসসি পরীক্ষায় ভালো ফল করা দরিদ্র মেধাবী

শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রতিবেদন করছে। সে তুলনায় শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যা, বিশেষত প্রত্যন্ত অঞ্চলে, খতিয়ে দেখে প্রতিবেদন কমই ছিল। টিভিতে খারাপ ঘটনা দেখাই হয়েছে খুব কম; সেখানে মূলত শিশুদের নিয়ে ভালো ভালো কথা আর প্রতিশ্রুতি বা ঘোষণা নিয়ে খবর করে বাস্তবকে অনেকটা চিনি দিয়ে মুড়ে দেখানো হয়েছে। (এমআরডিআই/ইউনিসেফ, ২০০৯)

— **প্রতিবেদনে মানবিক প্রেক্ষাপট :** রিপোর্টে মানুষ, মানুষের অভিজ্ঞতা বা জীবনের গল্প নিয়ে আসার চেষ্টা করবেন। তবে সব খবরে এ সুযোগ না, থাকতে পারে। এ উপাদানটি রিপোর্টে জোর করে এবং মাত্রাতিরিক্ত আনবেন না।

— **চটকদার রিপোর্ট :** সচেতনভাবে চটকদার রিপোর্ট করার প্রতি ঝোঁক কমানো দরকার। যেমন, কোনো সংস্থা পরিবারে নিকটজনের হাতে শিশুর যৌন নিপীড়ন নিয়ে কাজ করে। তারা শিশুর সুরক্ষার জন্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম চালায়, সে লক্ষ্যে তাদের কিছু পরামর্শ আছে। রিপোর্ট করতে গেলে আপনি এমন ঘটনার কেস স্টাডি খুঁজবেন না; সেটা ব্যবহার করলে খুবই সতর্কতা চাই *(দেখুন অধ্যায় ৩, 'যাদের অবস্থান বিশেষভাবে নাজুক বা অরক্ষিত')*। আপনি বরং রিপোর্টে প্রতিরোধের উপায় এবং সমস্যার তাৎপর্যকে গুরুত্ব দেবেন।

— **উপস্থাপন, রিপোর্টের সুর :** অনেক বিষয়ের রিপোর্টেই কিন্তু চটকদারি (সেনসেশনালিজম) ঢুকে পড়তে পারে। এ ছাড়া, শিশুকে কীভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে সেদিকে সতর্কতা চাই। ইতিবাচক খবর ও খবরে মানবিক প্রেক্ষাপট ব্যবহারে বিশেষ করে সংযম ও সতর্কতা দরকার। *(দেখুন গ. অংশ)*

— **সূত্র বাড়ানো, সূত্র বাছাই :** শিশুবিষয়ক রিপোর্টের জন্য সূত্র নির্বাচনের আওতা বাড়াতে হবে। প্রথম কথা, শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করে শিশুকে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র বিবেচনা করবেন। এ ছাড়া, একই মানুষজনের কাছে বারবার না গিয়ে নতুন ওয়াকিবহাল সূত্র বের করবেন। সূত্রের নির্ভরযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা খুব ভালোভাবে যাচাই করবেন। আইএফজের শিশুবিষয়ক নীতিমালা বলছে, কোনো সংস্থা নিজেকে শিশুর স্বার্থের প্রতিনিধি বলে দাবি করলে তার ঠিকুজি-কুষ্ঠি (ক্রেডেনশিয়ালস) তলিয়ে দেখতে হবে। কেবল একটি সূত্রের/প্রতিষ্ঠানের কথার ভিত্তিতে রিপোর্ট করবেন না।

— **বিশ্বাসযোগ্যতা, সুস্পষ্টতা :** রিপোর্টের বিশ্বাসযোগ্যতা, পূর্ণাঙ্গতা, সুস্পষ্টতা এবং আকর্ষণীয় উপস্থাপন বা পত্রিকার ক্ষেত্রে সুপাঠ্যতা বিশেষ গুরুত্ব পাবে। তথ্য সঠিক ও সত্য কি না সেটা খুব ভালোভাবে যাচাই করবেন। থিম ধরে রিপোর্টের যৌক্তিক বিন্যাস চাই। এ ছাড়া, ভাষায় মনোযোগ দরকার—এ অধ্যায়ের গ. অংশে সংবেদনশীলতা প্রসঙ্গে সতর্কতার কিছু ক্ষেত্র দেখবেন। আপাতত আমরা নজর দেব শিশুবিষয়ক রিপোর্ট পরিকল্পনার দিকে।

শিশুর মতামত-বক্তব্য নেই

সমীক্ষায় পাওয়া তিনটি রিপোর্ট :

- ✓ এক জেলায় অনেকগুলো উচ্চবিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ খালি থাকায় শিক্ষার সমস্যা নিয়ে করা একটি গভীরতাধর্মী রিপোর্টে কোনো শিশুকে খুঁজে পাওয়া যায় না। রিপোর্টটি হয়েছে জেলা শিক্ষা দপ্তরের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে।
- ✓ আরেকটি গভীরতাধর্মী রিপোর্টের বিষয় ছিল পরিত্যক্ত জেলা কারাগারে একটি স্কুল পরিচালনা নিয়ে। এটা 'কোমলমতি' শিশুদের জন্য ক্ষতিকর—এ ব্যাপারে রিপোর্টার অভিভাবক, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, এমন অনেক বড়দের সঙ্গে কথা বলেছেন। কথা বলা হয়নি শুধু শিশু শিক্ষার্থীদের সঙ্গে।
- ✓ তৃতীয় রিপোর্টটিও গভীরতাধর্মী হতে চেষ্টা করেছে। এটি একটি চরাঞ্চলে পুষ্টির সমস্যার ওপর করা রিপোর্ট। উলঙ্গ, অর্ধ-উলঙ্গ এক দল শিশুকে দাঁড় করিয়ে তোলা ছবিও আছে। রিপোর্টটি পড়লে বোঝা যায় এটা একটি এনজিওর কার্যক্রমকে তুলে ধরার জন্য লেখা। স্থানীয় মানুষজন বা শিশুদের সঙ্গে মোটেই কথা বলা হয়নি।

- কখনো এমন ঘাটতি হতে পারে সংবাদমাধ্যমগুলো রিপোর্টারকে ঘোরাঘুরির খরচ না দেওয়ার কারণে। আবার, অনেক সময় রিপোর্টার শিশুকে গুরুত্ব না দেওয়ার জন্যও এমন হতে পারে।

রিপোর্ট ভাবা এবং তথ্য সংগ্রহ ও বিন্যাসের পরিকল্পনা

— শিশুর জন্য জরুরি যে বিষয়ে রিপোর্ট করছেন, সেটা সম্পর্কে সাধারণভাবে ভালো ধারণা রাখুন; পড়াশোনা করুন; সংশ্লিষ্ট মানুষজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলুন। যত ছোট প্রতিবেদনই হোক, কাজে নামার আগে নির্দিষ্ট পশ্চাৎপট বা প্রেক্ষাপটের তথ্য জেনে নিন। পত্রিকার পুরোনো ফাইলে চোখ বোলান।

— নির্দিষ্ট রিপোর্টটির জন্য মূল/সবচেয়ে জরুরি/নতুন দিক ও বিষয়বস্তু চিহ্নিত করুন; এটাই আপনার সূচনার বিষয়বস্তু হবে। প্রতিবেদন ছোট হয়। চতুর্দিক ছড়িয়ে কোনো ঘটনা বা বিষয় জানালে শ্রোতা-দর্শক-পাঠক বুঝে উঠতে পারেন না, বিভ্রান্ত হন।

- মূল বিষয়বস্তু নির্ধারণের সময় শিশুসহ সংবাদের সব গ্রাহকের চাহিদা ও আগ্রহের কথা ভাববেন। তারা কী জানতে চাইবেন? কোন বিষয়বস্তু, কোন দিকটি তাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে? কোন দিকটি নতুন এবং সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ?
- আরও ভাববেন, অত্যাবশ্যক তথ্য কী লাগবে। কী না থাকলে মানুষের মনে প্রশ্ন রয়ে যাবে? বিশেষ করে, গভীরতাধর্মী প্রতিবেদনে মানুষের প্রয়োজন ও আগ্রহ মেটানোর মতো পর্যাপ্ত তথ্য লাগবে।

— মূল বিষয়বস্তু বা থিমটি চোখা করুন; ফোকাস ঠিক করুন। বিশেষ করে, গভীরতাধর্মী প্রতিবেদনের জন্য মূল থিমটি গবেষণার হাইপোথিসিসের মতো দাঁড় করান, ভেবে নিন এবং এক অনুচ্ছেদে লিখে ফেলুন। এটাই আপনার পুরো বিষয়কে এক সুতোয় গাঁথবে।

— আনুষঙ্গিক থিম কী কী হতে পারে তা ভেবে দু-এক কথায় লিখে ফেলুন। গভীরতাধর্মী বড় রিপোর্টেও পাঁচ-ছয়টির বেশি থিম রাখবেন না। বিষয়ের ব্যাপ্তি এর চেয়ে বড় হলে ধারাবাহিক প্রতিবেদন পরিকল্পনা করবেন।

— তথ্য সংগ্রহ এবং যাচাইয়ের পরিকল্পনা করুন। দিনের ঘটনার ছোট রিপোর্টে আপনি হয়তো তথ্যের খোঁজে ছুটতে ছুটতেই এটা ভেবে নেবেন। গভীরতাধর্মী প্রতিবেদনে বিশেষ করে :

✓ জ্ঞাতব্য প্রশ্নগুলো লিখে ফেলুন।

✓ কার কাছে কোথায় খুঁজবেন, কী দেখবেন, কী নথিপত্র-প্রমাণ লাগবে, কী পড়তে হবে সেটা ভেবে নিয়ে লিখে ফেলুন। জরুরি সব দিকের তথ্য পাওয়ার উপায় ভাববেন।

✓ ঘটনায় অত্যাবশ্যকভাবে জড়িত পক্ষগুলো চিহ্নিত করবেন।

✓ চতুর্থ অধ্যায়ে বলা বিষয়গুলো মাথায় রেখে শিশুর সাক্ষাৎকার ভেবেচিন্তে পরিকল্পনা করবেন।

✓ নিজে কী জানেন না, সে সম্পর্কে সজাগ থাকুন। অপরিচিত বা অজানা যেকোনো বিষয় জেনে না নিয়ে লিখবেন না।

✓ প্রতিবেদনে শিশুসহ যাদের বা যেসব সংস্থার নাম নেবেন তার সঠিক বানান জেনে নিন। নাম পুরো হওয়া চাই।

— তথ্য সংগ্রহ করতে নেমে আপনি আপনার থিমগুলো যাচাই করবেন, সত্যানুসন্ধান করবেন। মন খোলা রাখুন এবং থিমে প্রয়োজনমতো রদবদল করে খোঁজ করুন। রিপোর্টের জন্য প্রেক্ষাপটসমেত প্রয়োজনীয় পূর্ণাঙ্গ তথ্য জোগাড় করুন।

— অবশ্যই সরেজমিনে গিয়ে সরাসরি দেখবেন, ঘটনায় জড়িত মানুষজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন। উদাহরণ ও মানবিক প্রেক্ষাপট খুঁজবেন। রিপোর্টে মানুষের অভিজ্ঞতা এনে বিষয়কে বাস্তব ও প্রত্যক্ষ করে তুলতে হবে।

— ভুক্তভোগী/জড়িত শিশু ও সাধারণ মানুষজনসহ একাধিক ওয়াকিবহাল সূত্রের সঙ্গে কথা বলবেন; তাদের সজ্ঞান সম্মতি নেওয়া ও ব্যক্তিগত জীবনযাপনে নির্বিঘ্নতার দাবি মনে রাখবেন।

— স্পর্শকাতর বা ঝুঁকিপূর্ণ ঘটনায় জড়িত শিশুকে সুরক্ষা দিয়ে, প্রয়োজনে তার সঙ্গে কথা না বলে, তথ্য সংগ্রহ করবেন।

— প্রয়োজনীয় নথি-বইপত্র জোগাড় করে খুঁটিয়ে পড়বেন। নির্ভরযোগ্যতা বিচার ও প্রয়োজনীয় যাচাই করে ইন্টারনেটের তথ্যভান্ডারের সদ্ব্যবহার করবেন।

— খাতায় তারিখ দিয়ে ভালোভাবে নোট নেবেন।

— তথ্যের সূত্র বা উৎস নির্দেশ করার উপায় ভাববেন। কিছু সূত্রকে, বিশেষ করে ঘটনায় জড়িত কোনো শিশুকে, গোপনীয়তার সুরক্ষা দেওয়া জরুরি হতে পারে। সেসব ক্ষেত্রে তাদের বিপদে না ফেলে তথ্যের উৎস যথাসম্ভব সুনির্দিষ্ট করার উপায় ভাববেন। বিকল্প সূত্রের উল্লেখ করার সুযোগ খুঁজবেন।

— লেখার আগে রিপোর্টের কাঠামো ভেবে নিন। বিষয় বুঝে গুরুত্বের ক্রমানুসারে অথবা গল্প বলার তাগিদ অনুযায়ী মালমশলা ভাগে ভাগে গুছিয়ে নিন; যৌক্তিক ও সুসমঞ্জস বিন্যাস পরিকল্পনা করুন। সবার আগে লাগসই যথোপযুক্ত সূচনা গুছিয়ে নিন।

খ. শিশু অধিকার সনদ ও প্রাসঙ্গিক জাতীয় আইন

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা এ আন্তর্জাতিক সনদ এবং জাতীয় কিছু আইনে শিশুকালের বয়সসীমা প্রসঙ্গে বিধিবিধান দেখেছিলাম। সনদটি এবং জাতীয় কিছু আইন আপনার রিপোর্টের বিষয় ও দিকনির্দেশনা পাওয়া অন্যও গুরুত্বপূর্ণ হবে।

শিশু অধিকার সনদ

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ—ইউএনসিআরসি ২০ নভেম্বর, ১৯৮৯ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়। গুরুত্বপূর্ণ এই আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন তথা চুক্তিটি ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ তারিখ থেকে কার্যকর হয়। এর পরে ২৫ মে ২০০০ তারিখে এ সনদে দুটি ঐচ্ছিক বিধি বা অপশনাল প্রোটোকল যুক্ত হয়েছে।

যে ২২টি দেশ প্রথম এ সনদ অনুমোদন (র‍্যাটিফাই) করেছিল তাদের একটি বাংলাদেশ। বাংলাদেশ এটা অনুমোদন করে ৩ আগস্ট, ১৯৯০ তারিখে। বাংলাদেশ ২০০০ সালে ঐচ্ছিক বিধি দুটিও অনুমোদন করেছে। এ বই লেখা পর্যন্ত জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে কেবল সোমালিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের এ সনদ অনুমোদন করা বাকি রয়েছে। তবে সে দেশ দুটিও সনদে সই করেছে।

এ সনদ বলছে, প্রতিটি শিশু একেকজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি—নিজের দাবিতে মাথা তুলে চলার মতো পুরো মানুষ। তার ভালোভাবে বেঁচে থেকে, নিজের সবটুকু সম্ভাবনার পুরো বিকাশ করে, প্রয়োজনীয় সুরক্ষা পেয়ে, পরিবারে-সমাজে-জীবনে সক্রিয় অংশ নিয়ে নিরন্তর গড়ে ওঠার অধিকার রয়েছে। অধিকারগুলো ভোগ করে বেড়ে ওঠার প্রতিটি ধাপে সে তার বয়সোচিত দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করবে।

এ সনদের ৫৪টি অনুচ্ছেদে শিশুর মানবাধিকারের ব্যাপক বৃত্ত প্রতিফলিত হয়েছে এবং সেগুলো সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ও সরকারের দায়িত্ব চিহ্নিত হয়েছে। এ ছাড়া, শিশুর জীবনে পরিবারের ভূমিকাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাবা-মাসহ পরিবার ও সমাজ এবং বেসরকারি সংস্থার দায়িত্বের

কথা বলা হয়েছে; সামাজিক সুরক্ষার কথা এসেছে; গণমাধ্যমের ভূমিকার উল্লেখ আছে। অন্যদিকে, অন্যের অধিকার, বিশেষত বাবা-মার অধিকারকে শ্রদ্ধা করার ব্যাপারে শিশুর দায়িত্বের কথাও বলা হয়েছে।

মোট ৫৪ অনুচ্ছেদের ৪১টিতে একেকটি করে অধিকারের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। সনদ গুরুত্ব দিয়েছে যে, সব শিশুর একই অধিকার আছে; অধিকারগুলো পরস্পর-সম্পর্কিত এবং প্রতিটি অধিকারই সমান জরুরি। কঠিন পরিস্থিতিতে থাকা বা সুযোগবঞ্চিত শিশুদের জন্য বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলা হয়েছে।

সনদে বলা শিশুর অধিকারগুলোকে চারটি বড় ক্ষেত্রে ভাগ করা যায় :

— **বেঁচে থাকার অধিকার**—প্রতিটি শিশুর অধিকার আছে ভালোভাবে বেঁচে থাকার এবং সেজন্য যা-কিছু প্রয়োজন তা পাওয়ার। এ অধিকারগুলোর মধ্যে রয়েছে পুষ্টি, আশ্রয়, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ও পর্যাপ্ত মানসম্মত জীবনযাত্রার অধিকার।

— **বিকাশের অধিকার**—প্রতিটি শিশুর অধিকার আছে নিজের সবটুকু সম্ভাবনা বিকশিত করার। শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, মানসিক, নৈতিক, আত্মিক ও সামাজিক সব রকম বিকাশই শিশুর জন্য জরুরি। এ অধিকারগুলোর মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, খেলাধুলা ও অবকাশ উপভোগ, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, তথ্য পাওয়া এবং চিন্তা, বিবেক ও বিশ্বাস বা ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার।

— **সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার**—এ অধিকারগুলোর মধ্যে রয়েছে সব ধরনের নির্যাতন, আঘাত-অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা, দুর্ব্যবহার, শোষণ ও অবহেলা থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার। শরণার্থী শিশুর বিশেষ সুরক্ষা; শ্রমজীবী শিশুর জন্য সুরক্ষা-বন্দোবস্ত; মাদকাসক্তি ও মাদক ব্যবসায় ব্যবহৃত হওয়া থেকে সুরক্ষা; যৌন নিপীড়ন ও শোষণ থেকে সুরক্ষা; নির্যাতন/শোষণের শিকার শিশুদের দেখভাল ও পুনর্বাসন; ফৌজদারি আইন ও বিচার প্রক্রিয়ায় এর সংস্পর্শে আসা শিশুদের সুরক্ষা; এবং পরিবার-বিচ্ছিন্নতাসহ নাজুক পরিস্থিতিগুলোর কথা এসেছে।

— **অংশগ্রহণের অধিকার**—এ অধিকার বলছে, প্রতিটি শিশুকে তার পরিবারে, এলাকার সমাজে ও জাতীয় পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে দিতে হবে। এ অধিকারগুলোর মধ্যে পড়ছে শিশুর জীবনকে প্রভাবিত করার মতো বিষয়ে তার মতামত দেওয়া এবং সেটার গুরুত্ব পাওয়ার অধিকার। তার সক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সে আরও বেশি করে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে। এটা তার পূর্ণবয়স্ক দায়িত্বশীল মানুষ হওয়ার প্রস্তুতিরই অংশ। তার সংগঠন ও শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করার অধিকারের কথাও বলা হয়েছে।

আলাদা আলাদা অনুচ্ছেদে শরণার্থী শিশু (অনুচ্ছেদ ২২), প্রতিবন্ধী শিশু (অনুচ্ছেদ ২৩), জাতিগত/গোষ্ঠীগত/ধর্মীয়/ভাষাগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর শিশু ও আদিবাসী শিশু (অনুচ্ছেদ ৩০) এবং তাদের অধিকারকে সুনির্দিষ্টভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সিআরসির অপশনাল প্রোটোকল দুটি খুবই নাজুক ও ঝুঁকিপূর্ণ কিছু পরিস্থিতি থেকে শিশুর সুরক্ষার অধিকারের কথা বলছে :

— শিশু বিক্রি, শিশুকে যৌনবৃত্তি ও পর্নোগ্রাফিতে ব্যবহার করা।

— সশস্ত্র সংগ্রামে/যুদ্ধে শিশুকে জড়িত করা।

এদিকে, চারটি অনুচ্ছেদকে সনদে বর্ণিত সবগুলো অধিকার বাস্তবায়নের ভিত্তি-বিবেচনা হিসেবে গণ্য করা হয়। 'সাধারণ মূলনীতি' বলে পরিচিত এ অনুচ্ছেদগুলো হচ্ছে :

✓ **অনুচ্ছেদ ২—বৈষম্যহীনতা :** সনদে বর্ণিত সবগুলো অধিকার সকল শিশুকেই দিতে হবে। গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক ভিন্নমত, জাতীয়তা অথবা সামাজিক পরিচয়, অর্থনৈতিক অবস্থা, সামর্থ্য, জন্মসূত্রে, কিংবা বংশগত অবস্থান—কোনো কারণেই কোনো বৈষম্য করা যাবে না।

✓ **অনুচ্ছেদ ৩—সর্বোত্তম স্বার্থ :** শিশুসংক্রান্ত যে-কারও যেকোনো কাজে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থই প্রথম বিবেচনা পাবে। সরকারি, বেসরকারি সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান, আদালত, প্রশাসন—সবার কর্মকাণ্ডকেই এটা মেনে চলতে হবে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব থাকবে, বাবা-মা বা আইনসংগত অভিভাবক শিশুর কল্যাণের দায়িত্ব পালন করছেন কি না তা নিশ্চিত করা।

✓ **অনুচ্ছেদ ৬—জীবন ও উন্নয়ন :** জীবন প্রতিটি শিশুর জন্মগত অধিকার। প্রতিটি শিশুর বেঁচে থাকা ও উন্নয়ন/বিকাশের নিশ্চয়তা পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

✓ **অনুচ্ছেদ ১২—মতপ্রকাশ ও সেটার গুরুত্ব :** শিশুকে প্রভাবিত করে এমন যেকোনো বিষয়ে তার মতামত বিবেচনায় নিতে হবে। মতামত জানানোর ক্ষমতা যার হয়েছে সে-ই মত ও ধারণা প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারী। শিশুর বয়স ও নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতা অনুযায়ী এসব মতামতের যথাযথ গুরুত্ব পাওয়া নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে শিশুকে পরিস্থিতি অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট সুযোগ দিতে হবে।

অনুমোদন ও বাস্তবায়ন—বাংলাদেশ পরিস্থিতি : এ সনদ অনুমোদন করা মানে এর বিধানগুলো বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক আইনগতভাবে বাধ্য থাকা। সনদে বলা আছে, অনুমোদনকারী রাষ্ট্র শিশুর এসব অধিকার বাস্তবায়নের জন্য সব ধরনের আইনগত, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। এজন্য প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক সহায়তার কথা বলা আছে। অধিকারগুলো সম্পর্কে শিশুসহ সবাইকে জানানোর কার্যকর উদ্যোগ নেওয়াও রাষ্ট্রের দায়িত্বের মধ্যে পড়বে।

সনদ বাস্তবায়ন পরিস্থিতির নজরদারি করার জন্য আছে আন্তর্জাতিকভাবে নির্বাচিত স্বাধীন/স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত শিশু অধিকার কমিটি। এ কমিটির কাছে সনদ অনুমোদনকারী দেশগুলোর নিজ নিজ দেশে শিশুর পরিস্থিতি সম্পর্কে নিয়মিত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার কথা। সে প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে কমিটি পরামর্শ দিয়ে থাকে। কমিটি রাষ্ট্রগুলোকে শিশুর জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নিতে উৎসাহিত করে।

বাংলাদেশ সনদটি অনুমোদন করার সময় দুটি অনুচ্ছেদ সম্পর্কে অপারগতা (রিজার্ভেশন) প্রকাশ করেছিল :

✓ **অনুচ্ছেদ ১৪-এর প্রথম স্তবক**—শিশুর চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে সম্মান জানানোর প্রশ্নে।

✓ **অনুচ্ছেদ ২১**—শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ বিবেচনা করে শিশুকে দত্তক নেওয়ার ব্যবস্থা করার প্রশ্নে। বাংলাদেশ বলেছে, বিদ্যমান আইন ও প্রথার সঙ্গে সংগতি রেখে এ প্রশ্নে কাজ করা হবে। ইসলামের ধর্মীয় বিধিনিষেধের কারণে বাংলাদেশে দত্তক নেওয়া আইনসিদ্ধ নয়; কেবল অভিভাবকত্ব নেওয়া চলে।

ওপরে বর্ণিত আপত্তি দুটি এখনো তুলে নেওয়া হয়নি। সিআরসির সঙ্গে সামঞ্জস্য করে আইনগত সংস্কার বা প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়নে ঘাটতি আছে; এ প্রসঙ্গে কিছু বিতর্কও আছে। এ ছাড়া, কমিটির কাছে পাঁচ বছরওয়ারি প্রতিবেদন পেশ করার কাজে ঢিলেমি হয়েছে।

সাংবাদিকের জন্য সিআরসির তাৎপর্য : এর আগে বলেছি, নৈতিক দায়িত্ব পালন করতে চাইলে শিশু অধিকারের বিষয়গুলো রিপোর্ট করতে হবে। এ সনদ যেমন সে ক্ষেত্রে সাহায্য করবে, তেমনি এটা আপনাকে শিশু সম্পর্কে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি-চিন্তাভাবনা ফিরে দেখতে অনুপ্রাণিত করবে।

— শিশু অধিকারের সবগুলো ক্ষেত্র ও মাত্রা বোঝার জন্য সিআরসি সম্পর্কে ভালোভাবে জানা দরকার। রিপোর্ট করার নতুন নতুন বিষয় ও ফোকাস খুঁজে পাবেন। পরিশিষ্ট ৪-এ তথ্যসূত্রে কয়েকটি ওয়েব-ঠিকানা পাবেন, যেখানে সনদ সম্পর্কে চুম্বক কিছু প্রশ্নের উত্তর ও বিশদ ব্যাখ্যা মিলবে। তথ্যসূত্রে কিছু প্রকাশনার হদিসও পাবেন। সনদ সম্পর্কে ব্যাখ্যা বা সহজ পাঠগুলো যেমন কাজে লাগবে তেমনি পুরো সনদটিও দেখা দরকার। বাংলায় দুটি পুস্তিকা আছে, পরিশিষ্ট ৪-এ দেখুন।

— নৈতিকতার দাবি মিটিয়ে রিপোর্ট করার তাগিদ থেকে আপনাকে এ সনদের বিধিবিধানগুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে। রাষ্ট্রসহ যেকোনো কর্তৃপক্ষ এটা কতটা মানছে বা মানছে না, সেটা আপনার নজরদারির জরুরি ক্ষেত্র হতে পারে।

— জাতিসংঘের শিশু অধিকার কমিটির কাছে বাংলাদেশ তৃতীয় ও চতুর্থ কিস্তির পাঁচ বছর মেয়াদি প্রতিবেদন একত্রে পেশ করেছিল আগস্ট, ২০০৭ সালে। সেটা খতিয়ে দেখে ২০০৯ সালের জুনে কমিটি তার পর্যবেক্ষণ/পরামর্শ জানিয়েছে। সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, ইউনিসেফ অথবা শিশুদের নিয়ে কাজ করা এনজিওদের কাছে এ প্রতিবেদনটির কপি খোঁজ করুন। (পরিশিষ্ট ১-এ তথ্যসূত্রে এগুলো দেখার জন্য ওয়েব-ঠিকানা পাবেন)

  এ দুটি প্রতিবেদনে দেশের সাম্প্রতিক প্রাসঙ্গিক আইনি পদক্ষেপগুলো এবং সে সম্পর্কে কমিটির মতামত পাবেন। বাংলাদেশে শিশুর অধিকার প্রসঙ্গে জরুরি বিষয়গুলোর কথা পাবেন। দেখবেন যে, কমিটি বেশকিছু বিষয়ে বাংলাদেশকে মনোযোগী হতে বলেছে। গভীরে তলিয়ে অনুসন্ধানী রিপোর্ট করার অনেকগুলো ক্ষেত্র পাবেন। এমন কিছু বিষয় :

  ✓ শিশুর জন্য বাজেট বরাদ্দ, শিশু নির্যাতন, শিশু বিক্রি/পাচার, শিশুকে দিয়ে বাণিজ্যিক যৌনকর্ম, পর্নোগ্রাফি, যৌন হয়রানি বা শিশু-কিশোরীকে উত্ত্যক্ত করা, ঝুঁকিপূর্ণ

শিশুশ্রম, জন্মনিবন্ধন, বাল্যবিবাহ ও কিশোরী মাতৃত্ব, দারিদ্র্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিস্থিতিতে শিশু, এইচআইভি/এইডস এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রের বিভিন্ন পরিস্থিতি। এখানে শিশুর বয়স নির্ধারণ বিষয়ে যে পরামর্শ রয়েছে এবং সেটা নিয়ে যে কিছুটা দ্বিমত আছে, তা ধরেও জরুরি ব্যাখ্যামূলক রিপোর্ট হতে পারে। *(পরে দেখুন, 'প্রসঙ্গ শিশুর বয়স')*

✓ কমিটির কাছে কিন্তু বেসরকারি সংস্থাদেরও স্বতন্ত্র প্রতিবেদন জমা দেওয়ার কথা। শিশু অধিকার নিয়ে কর্মরত সংস্থাগুলোর কাছে এ সম্পর্কে তাদের তৎপরতার খোঁজ করতে পারেন।

— কমিটি সরকারকে আগামী ২০১২ সালের ২০ অক্টোবরের মধ্যে পঞ্চম কিস্তির প্রতিবেদন জমা দিতে বলেছে। এটার প্রক্রিয়ার ওপর নজর রাখলে রিপোর্ট করার জন্য ভালো উপলক্ষ বা নিউজপেগ মিলতে পারে।

প্রাসঙ্গিক জাতীয় আইন

অনেকগুলো কারণেই শিশুসংক্রান্ত জাতীয় আইনগুলো ভালোভাবে জানার গুরুত্ব আছে। শিশুসংক্রান্ত যেসব বিষয়ে রিপোর্ট করতে গেলে আইনের ধারণা প্রয়োজন হবে সে পরিস্থিতিগুলোর মধ্যে রয়েছে :

✓ শিশু যখন কোনো অপরাধ, সহিংসতা, নির্যাতন, শোষণের শিকার হচ্ছে অর্থাৎ সে যখন ভিকটিম।

✓ বিশেষভাবে জরুরি হবে যৌন নির্যাতন ও হয়রানি, অ্যাসিড-সন্ত্রাস, হয়রানি-শোষণ-নির্যাতনের কারণে হত্যা বা আত্মহত্যার মতো ক্ষেত্রগুলো।

✓ শিশুকে যৌনবৃত্তিতে ব্যবহার করা।

✓ শিশু পাচার।

✓ শিশু যখন ফৌজদারি আইনপরিপন্থী অথবা গুরুতর সমাজবিরোধী কোনো কাজে জড়িয়ে পড়ে অর্থাৎ সে যখন অভিযুক্ত বা অপরাধমূলক কাজ করেছে বলে প্রমাণিত হয়। বিশেষভাবে জরুরি হবে তার সম্পর্কে আইনি প্রক্রিয়া, তার প্রতি আইনি প্রক্রিয়ায় জড়িতদের আচরণ, তার হেফাজত, সুরক্ষা, তার প্রতি কোনো অপরাধের দায়িত্ব আরোপ, বিচার প্রক্রিয়া ও তার প্রতি আইনি ব্যবস্থা বা বিধানের ক্ষেত্রগুলো।

✓ সাংবাদিকতা ও সংবাদমাধ্যমের আচরণ/করণীয় সম্পর্কে আইনি বাধ্যবাধকতা; বিশেষ করে, ওপরের দুই ক্ষেত্রে, সাধারণভাবে ব্যক্তির মানসম্মান ও অশ্লীলতার প্রসঙ্গে, এবং যেকোনো মামলা চলাকালে আদালতের বিধিনিষেধ-সংক্রান্ত।

✓ শিশুশ্রম, বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম।

✓ বাল্যবিবাহ।

✓ শিশুর প্রতিপালন, অভিভাবকত্ব, উত্তরাধিকার, সম্পত্তির অধিকারসহ বিভিন্ন পারিবারিক বিষয়ে।

- ✓ যেকোনো চুক্তিতে যখন কোনো শিশুর জড়িত থাকার প্রশ্ন উঠবে তখন।
- ✓ শিশুর নাগরিকত্ব এবং জন্মের স্বীকৃতি ও অধিকারের প্রশ্নে।

মনে রাখা প্রয়োজন, এ ক্ষেত্রগুলো কিন্তু শিশু অধিকার সনদেরও বিবেচ্য বিষয়। বাংলাদেশে এসব ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বেশকিছু আইন আছে। এর মধ্যে উল্লেখ্য :

- ✓ **শিশু আইন, ১৯৭৪**
- ✓ **নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩)**
- ✓ **দণ্ডবিধি, ১৮৬০–৮২ নম্বর ধারা; অপরাধের দায়িত্ব আরোপসংক্রান্ত**
- ✓ **সাবালকত্ব আইন, ১৮৭৫**
- ✓ **সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২**
- ✓ **বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬**
- ✓ **বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯**
- ✓ **অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ১৮৯০**
- ✓ **বিভিন্ন ধর্মানুসারী পারিবারিক আইন**
- ✓ **জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন আইন, ২০০৪**
- ✓ **নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০৯**
- ✓ **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ১৭ (১), ১৮, ও ২৮ নম্বর অনুচ্ছেদ;** দেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানের এ অনুচ্ছেদগুলো শিশুর কল্যাণ ও অধিকারের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

এ ছাড়া নীতি-নৈতিকতার সুবাদে সাধারণভাবে কিছু আইন মনে রাখা দরকার :

- ✓ **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ৩১ ও ৩৯ নম্বর অনুচ্ছেদ;** সংবিধানের এ অনুচ্ছেদগুলোয় নাগরিকদের প্রাসঙ্গিক কিছু অধিকার ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার নিশ্চয়তার কথা আছে।
- ✓ **প্রেস কাউন্সিল আইন, ১৯৭৪**
- ✓ **দণ্ডবিধি, ১৮৬০–৪৯৯ ও ৫০০ নম্বর ধারা; ২৯২, ২৯৩ ও ২৯৪ নম্বর ধারা; ২৯৫ (ক) ধারা; এবং আদালত-অবমাননার ঝুঁকি।**

শিশু এবং সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতার জন্য এসব আইনের প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক দেখা যাক। পর্যায়ক্রমে শিশুকালের বয়সসীমা নিয়ে জটিলতা এবং বিভিন্ন বিবেচনার কথাও আসবে।

শিশু আইন, ১৯৭৪ : বাংলাদেশের ১৯৭৪ সালের শিশু আইনটি শিশুর সুরক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রের দায়িত্বের কথা বলছে। এ আইনটিকে অনেক সময় শিশুর জন্য সামাজিক কল্যাণমূলক আইন হিসেবেও ব্যাখ্যা করা হয়। এ আইনে শিশুর প্রাতিষ্ঠানিক হেফাজত, যত্ন, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানের বিষয়গুলো এসেছে।

— এখানে সহায়সম্বলহীন, অরক্ষিত অবস্থায় বা কঠিন পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকা, শোষণ-অপরাধের পরিবেশে বড় হওয়া অথবা অবহেলা ও নিষ্ঠুরতার শিকার শিশুদের তত্ত্বাবধান ও সুরক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং করণীয় চিহ্নিত হয়েছে।

— এ আইনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে, ফৌজদারি আইনপরিপন্থী কাজে জড়িয়ে পড়া বা ফৌজদারি আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের বিচার ও তাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়ার বিশেষ বিধান। সিআরসিতে যেমন এদের জন্য বিধিবিধান আছে, তেমনি জাতিসংঘের সনদের অনেক আগে প্রণীত জাতীয় এ আইনটিতেও সুচিন্তিত অনেকগুলো নির্দেশনা রয়েছে। যেমন :

- ফৌজদারি অপরাধমূলক কাজে অভিযুক্ত শিশুর বিচার কখনোই প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে একত্রে হবে না; আলাদা শিশু আদালতে হতে হবে; তার স্বার্থ দেখভালের জন্য, তাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য প্রোবেশন কর্মকর্তা নিযুক্ত থাকবেন। সে কাজ যা-ই হোক না কেন, শিশুকে 'অপরাধী' বলা যাবে না বা তার কোনো সাজা হবে না। তার সম্পর্কে যত্ন, দিকনির্দেশনা-পরামর্শ, সুরক্ষা ও সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। রাষ্ট্র কর্তৃক আটকের মাধ্যমে সেটা করা হবে সর্বশেষ পন্থা। এ ছাড়া, শিশুকে কারাগারে রাখা যাবে না। বিশেষ প্রতিষ্ঠানে তাকে আটকের সিদ্ধান্ত নিলে সেটা হতে হবে যথাসম্ভব কম সময়ের জন্য এবং ছেলে মেয়ের জন্য আলাদা বিবেচনা রেখে। সব পর্যায়ে তাকে পরিবারে ফিরিয়ে দিতে সচেষ্ট থাকতে হবে।

- আইনটিতে শিশুকে কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচানো, তার ব্যক্তিগত জীবনযাপনের অধিকার, তার প্রতি বাবা-মায়ের কর্তব্য—এসব বিবেচনা গুরুত্ব পেয়েছে। আদালত ও রাষ্ট্রসহ জড়িত সকল পক্ষের প্রথম ও প্রধান বিবেচনা হবে এমন শিশুর সর্বোত্তম কল্যাণ। এ আইনের পরিক্রমায় এমন বিচারিক সিদ্ধান্ত এসেছে যে, পুলিশের হাতে এমন কোনো শিশু পৌঁছানোর পর দ্রুত তার বাবা-মার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। দ্রুত প্রোবেশন কর্মকর্তা নিয়োগ করে তাঁর মাধ্যমে আদালতকে অবগত করতে হবে। এমন শিশুর হেফাজত, যত্ন, সুরক্ষা ও কল্যাণ সম্পর্কে সব পদক্ষেপে ওই শিশুর নিজের, তার বাবা-মা/অভিভাবক, পরিবারের সদস্য এবং সমাজকল্যাণ সংস্থাদের মতামত আমলে নিতে হবে।

— তবে প্রাক-বিচার পর্বে শিশুর প্রতি মানবিক আচরণের সুনির্দিষ্ট বিধান এবং সালিস-মীমাংসার সুযোগ না রাখাসহ আইনটির কিছু সমালোচনা আছে। এ ছাড়া, এ আইনে শিশুর বয়সসীমা অনূর্ধ্ব-১৬, যেটা শিশু অধিকার সনদের চেয়ে কম।

— এ আইনটি ছাড়াও ফৌজদারি আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের বেলায় অপরাধের দায়িত্ব আরোপ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। এর জন্য ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির ৮২ নম্বর ধারা প্রাসঙ্গিক হয়। বয়সের জটিলতা নিয়ে আলোচনায় সেটা দেখব।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ : এ আইনটি নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সংঘটিত অনেকগুলো অপরাধের বিচারের জন্য প্রণীত হয়েছে।

— এর মধ্যে রয়েছে দহনকারী-ক্ষয়কারী বা বিষাক্ত পদার্থ দিয়ে মৃত্যু ঘটানো বা সে চেষ্টা, তা থেকে অঙ্গহানি বা বিকৃতি; ধর্ষণ ও সে কারণে মৃত্যু; যৌতুকের জন্য নারীর মৃত্যু ঘটানো; যৌন পীড়ন; পাচার; অপহরণ; আত্মহত্যায় প্ররোচনা; ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগের উদ্দেশ্যে শিশুর অঙ্গহানি এবং ধর্ষণের ফলে জন্মানো শিশুসংক্রান্ত বিধান।

— বিদ্যমান অন্য কোনো আইনে যা-কিছুই থাকুক না কেন, এসব বিষয়ে এ আইনটিই প্রাধান্য পাবে। এর আওতায় পড়া অপরাধের বিচার কেবল এর জন্য গঠিত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে করা যাবে। ক্যামেরা ট্রায়াল অর্থাৎ রুদ্ধদ্বার কক্ষে বিচারের সুযোগ রাখা হয়েছে। আসামি পলাতক থাকলেও তার অনুপস্থিতিতে বিচার করা চলবে। এ আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড এবং সেই সঙ্গে অনূর্ধ্ব এক লাখ টাকা জরিমানা।

— আইনটির ধারা ৩১-এ বলা হয়েছে যে, বিচার চলাকালে ট্রাইব্যুনাল ওই নারী বা শিশুকে নিরাপত্তামূলক হেফাজতে রাখা দরকার মনে করলে তাকে রাখতে হবে কারাগারের বাইরে। সেটা সরকারি কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তা হেফাজতের স্থান হতে পারে। আবার, ট্রাইব্যুনালের বিবেচনায় যথাযথ বলে গণ্য কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার কাছেও তাকে রাখা যেতে পারে।

— লক্ষণীয় যে, সংশোধিত এ আইনে শিশু/কিশোরীর যৌন হয়রানি সম্পর্কে সরাসরি কোনো কথা রাখা হয়নি; যদিও এর ১০ নম্বর ধারায় নারী ও শিশুর যৌন পীড়নের প্রসঙ্গ আছে। এ ছাড়া, নারী পাচার প্রসঙ্গে যৌনবৃত্তিতে নিয়োগের কথা এলেও শিশু পাচারের ক্ষেত্রে সরাসরি সে কথা খুলে বলা হয়নি। যৌনবৃত্তিতে অপ্রাপ্তবয়স্ক কাউকে নিয়োগের নিষেধাজ্ঞা ও সাজা অবশ্য পুলিশ অধ্যাদেশসহ আরও দু-একটি আইনে আছে।

— এদিকে এ আইনেও শিশুর বয়সসীমা অনূর্ধ্ব-১৬, অর্থাৎ শিশু অধিকার সনদের চেয়ে কম। এ আইনটির অপপ্রয়োগের ব্যাপক অভিযোগ আইনটি সম্পর্কে বিরূপ বা সন্দিহান ধারণা সৃষ্টি করেছে।

সাংবাদিকের জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশ : ওপরে বর্ণিত দুটি আইনেই এগুলোর সংস্পর্শে আসা শিশুর নাম-পরিচয়ের সুরক্ষা অর্থাৎ শিশুকে শনাক্ত না করানোর বিধান রয়েছে।

— শিশু আইনের ধারা ১৭ বলছে যে, এ আইনের অধীনে আদালতে চলা কোনো মামলা বা আইনি কার্যধারার সংবাদ প্রতিবেদনে জড়িত শিশুটি সম্পর্কে এমন কোনো বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া যাবে না, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাকে শনাক্ত করতে সাহায্য করবে। তার কোনো ছবিও প্রকাশ করা যাবে না।

তবে এ ধারাটিতে আরও বলা আছে যে, লিখিত কোনো কারণ সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট আদালত পরিচয় প্রকাশকে শিশুর কল্যাণের স্বার্থসম্মত মনে করলে এবং জড়িত শিশুটির স্বার্থে সেটা কোনো বিরূপ প্রভাব আনবে না মনে করলে শনাক্তকরণের অনুমতি দিতে পারেন।

- এ ধারাটি তলিয়ে ভাবলে আরও বোঝা যায় যে, আইনটির একটি মূল লক্ষ্য হচ্ছে আইনপরিপন্থী কাজে জড়িত শিশুকে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। সাজা দিয়ে তাকে বিষিয়ে দিলে, নিজেকে পাল্টানোর সুযোগ না দিলে অথবা আপনি পরিচয় প্রকাশ করে তাকে ধিক্কার-বিড়ম্বনার মধ্যে ঠেলে দিলে শিশুটি অপরাধের জগতেই রয়ে যেতে পারে। সেটা ওই শিশুটির প্রতি যেমন অন্যায্য হবে, তেমনি সমাজের জন্যও হানিকর হবে।

— নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ধারা ১৪ সংবাদমাধ্যমে অপরাধের শিকার নারী বা শিশুকে শনাক্ত না করতে বলছে। এর নিষেধাজ্ঞাটি আরও স্পষ্ট : 'এই আইনে বর্ণিত অপরাধের শিকার হয়েছেন এরূপ নারী ও শিশুর ব্যাপারে সংঘটিত অপরাধ বা তৎসম্পর্কিত আইনগত কার্যধারার সংবাদ বা তথ্য বা নাম-ঠিকানা বা অন্যবিধ তথ্য কোন সংবাদপত্র বা অন্য কোন সংবাদমাধ্যমে এমনভাবে প্রকাশ বা পরিবেশন করা যাবে যাতে উক্ত নারী বা শিশুর পরিচয় প্রকাশ না পায়।'

- এ নির্দেশ লঙ্ঘন করলে দায়ী সাংবাদিক/সাংবাদিকদের প্রত্যেককে অনধিক দুই বছর জেল খাটতে হবে বা অনূর্ধ্ব এক লাখ টাকা জরিমানা গুনতে হবে অথবা দুটি দণ্ডেই ভুগতে হবে।

— **দুটি আইনের পরিচয়-গোপন সংক্রান্ত নির্দেশ** মিলিয়ে পড়লে বলা যায়, নির্দিষ্ট কিছু অপরাধের শিকার শিশুর নাম-পরিচয়-ছবি-শনাক্তকরণযোগ্য তথ্য, বিশেষত সে যৌন নিপীড়নের শিকার হলে, আপনি কখনো প্রকাশ করবেন না। লক্ষ করুন, নারী ও শিশুরা আইনবর্ণিত যেকোনো অপরাধের শিকার হলে, যেমন পাচার বা অপহরণের ক্ষেত্রেও, সংবাদে তাদের পরিচিতি প্রকাশ কিন্তু আইনত দণ্ডনীয় হচ্ছে। এ ছাড়া, ফৌজদারি আইনপরিপন্থী কাজে জড়িত শিশু সম্পর্কে যেকোনো প্রতিবেদনেই তার পরিচয়ের গোপনীয়তা মানা দরকার। তার সম্পর্কে 'অপরাধী' বা 'সাজা'জাতীয় কোনো শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। আরও লক্ষ করুন, সংবাদে পরিচয় গোপন রাখার আইনগত বিধান কিন্তু মৃত্যুর পরও প্রযোজ্য বলে বিবেচনার সুযোগ আছে।

মনে রাখা ভালো, পরিচয় গোপনের এই বিধান করা হয়েছে শিশুর সর্বোত্তম কল্যাণের লক্ষ্যে। অর্থাৎ এটা বলছে, সংবাদযোগ্য ঘটনায় জড়িত কোনো শিশুর কোনো ক্ষতি বা বিপত্তি না ঘটানোর দিকে কড়া নজর রেখে রিপোর্ট করতে হবে। (দেখুন বক্স : 'ধর্ষণের শিকার ও অপরাধমূলক কাজে জড়িত/অভিযুক্ত শিশু')

— **আইনপরিপন্থী কাজে জড়িয়ে পড়া শিশুর ক্ষেত্রে** বিচার প্রক্রিয়ায় শিশু আইন মানা না হলে সেটা রিপোর্ট করা খুব জরুরি। শিশুর বয়স প্রমাণ, আলাদা আদালত গঠন, প্রোবেশন

অফিসার নিয়োগ, তার সম্পর্কে কী ব্যবস্থা হচ্ছে, কোথায় তাকে রাখা হচ্ছে—এ সবই রিপোর্ট করার বিষয়।

শ্রম আইন ২০০৬ (ধারা ৩৪ থেকে ৪৪) : বাংলাদেশে শিশুশ্রম যেমন বড় একটি সমস্যা, তেমনি দারিদ্র্যের প্রেক্ষাপটে এটা অনভিপ্রেত একটি বাস্তবতা। আইনটি এ বাস্তবতাকে আমলে নিয়ে শিশুর ঝুঁকি কিছুটা কমানোর কথা বলছে। তবে ফাঁকফোকর ও আপনার প্রশ্ন করার যথেষ্ট জায়গা আছে।

— এ আইনে ১৪ বছরের কম বয়সীরা শিশু এবং তাদের কোনো শ্রমে নিয়োগ করা যাবে না। তবে ১২ থেকে ১৪ বছর বয়স অব্দি শিশুকে এমন কোনো হালকা কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে, যা তার স্বাস্থ্য বা উন্নতির জন্য বিপজ্জনক হবে না এবং তার লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটাবে না। শিশুটি স্কুলে গেলে তাকে কাজ করাতে হবে সে সময়ের বাইরে।

— বয়স ১৪ পূর্ণ হলে সে ১৮ বছরের হওয়ার আগ পর্যন্ত কিশোর হিসেবে বিবেচিত হবে। একজন নিবন্ধিত চিকিৎসকের কাছ থেকে সক্ষমতার প্রত্যয়নপত্র নিয়ে কিশোরকে কাজে নিয়োগ দেওয়া যাবে। এ প্রত্যয়নপত্রের খরচ/ফি নিয়োগকর্তা দেবেন। কোনো পেশা বা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিশি অথবা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে নিয়োগের জন্য এ প্রত্যয়নপত্র লাগবে না। এ ছাড়া, জরুরি অবস্থা বিরাজমান থাকলে এবং জনস্বার্থে প্রয়োজন মনে করলে সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপন দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সক্ষমতা-প্রত্যয়নপত্রের আবশ্যকতার বিধান স্থগিত করতে পারবে।

— তবে কিশোরকে কোনো ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিযুক্ত করা যাবে না। আইনে এমন কিছু কাজ ও শর্ত সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে :

✓ যন্ত্রপাতি চালু অবস্থায় সেটা পরিষ্কার করা, তাতে তেল দেওয়া বা অন্য কোনো কাজের জন্য যন্ত্রের ঘূর্ণায়মাণ অংশের মাঝখানে বা কাছাকাছি কোনো কিশোরকে প্রবেশ করানো যাবে না।

✓ সরকারঘোষিত বিপজ্জনক যন্ত্রপাতির কাজে কিশোরকে নিয়োগ করতে হলে কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে—

* তাকে ঝুঁকিগুলো এবং প্রয়োজনীয় সাবধানতার ব্যবস্থা সম্পর্কে পরিষ্কার জানাতে হবে;

* ওই কাজে তার পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ থাকতে হবে অথবা তাকে কোনো পুরোপুরি অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে কাজ করতে হবে।

✓ সরকারকে সময় সময় গেজেট বিজ্ঞপ্তি দিয়ে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা প্রকাশ করতে হবে এবং সেসব কাজে কিশোরবয়সী কাউকে নিয়োগ করা যাবে না।

✓ কিশোরকে দিয়ে ভূগর্ভে বা পানির নিচে কোনো কাজ করানো যাবে না।

— এ ছাড়া, কিশোরকে দিয়ে দিনে এবং সপ্তাহে নির্দিষ্ট সময়ের বেশি কাজ করানো যাবে না:

- ✓ কারখানা বা খনিতে দিনে পাঁচ ঘণ্টা এবং সপ্তাহে ৩০ ঘণ্টার বেশি নয়। লক্ষ করুন, ভূগর্ভে কাজ নিষিদ্ধ হলেও 'খনি'তে কাজের কথা বলা হয়েছে।
- ✓ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে দিনে সাত ঘণ্টা এবং সপ্তাহে ৪২ ঘণ্টার বেশি নয়।
- ✓ সন্ধ্যা সাতটা থেকে সকাল সাতটার মধ্যে কিশোরকে দিয়ে কাজ করানো যাবে না।

— কিশোরকে দিয়ে বাড়তি সময় বা ওভারটাইম কাজ করাতে হলে কারখানা বা খনিতে তার মোট কাজের সময় সপ্তাহে ৩৬ ঘণ্টা ছাড়াতে পারবে না। অন্য প্রতিষ্ঠানে এ সীমা সপ্তাহে মোট ৪৮ ঘণ্টা।

— আইন মানা হচ্ছে কি না এবং এর নজরদারি তথা বিদ্যমান পরিদর্শন ব্যবস্থার দুর্বলতা আপনার দেখার বিষয় হবে। বাস্তবে আইনত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ শোষণমূলক শ্রমেও কিন্তু শিশুকে নিযুক্ত করা হচ্ছে। চরম নির্যাতন না ঘটলে শ্রমজীবী শিশুদের একটা বড় অংশ—শিশু গৃহশ্রমিকের পরিস্থিতি সংবাদে আসে না।

- সরকার অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা নিয়মিত প্রকাশ করে কি না, সে তালিকা পর্যাপ্ত কি না সেটা খোঁজ করা দরকার।
- অন্যদিকে, আইনে কোনো বিশেষ কাজের বাধা না থাকলেও সেটা শিশু-কিশোরের জন্য অন্যায্য বা অমানবিক হতে পারে। সে সম্ভাবনা সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে, খোঁজ রাখতে হবে, রিপোর্ট করতে হবে। শিশুর নিজ পরিবারভিত্তিক শ্রমে অন্যায় বা অন্যায্যতা চোখের আড়ালেই রয়ে যাচ্ছে।
- এ ছাড়া, কাজের মজুরি এবং পরিবেশ নিয়ে রিপোর্ট করার সুযোগ সব সময় আছে।

সাবালকত্ব আইন, ১৮৭৫ : এ আইন বলছে, ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে কোনো ব্যক্তি কোনো চুক্তির পক্ষ হতে পারবে না বা তার সঙ্গে কোনো রকম চুক্তি করা যাবে না। কিন্তু মনে রাখুন—এ আইনটির বয়সের সীমাসংক্রান্ত বিধান বিয়ে, তালাক ইত্যাদি পারিবারিক বিষয়ে এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না।

বিভিন্ন পারিবারিক আইন : বিয়ে, বিবাহবিচ্ছেদ, সন্তানের অভিভাবকত্ব, সম্পত্তির উত্তরাধিকার—ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন ধর্মানুসারী পারিবারিক আইন কার্যকর হয়। এ আইনগুলোর পরস্পরের মধ্যে সমতা নেই। ফলে একেক ধর্মের শিশুদের এসব অনেক অধিকার একেক রকম হয়ে যায়।

- ✓ মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১তে অনেকখানি যুগোপযোগী সংস্কার হয়েছে। কিন্তু তার পরও সাধারণ আইনের সঙ্গে পার্থক্য রয়ে গেছে।
- ✓ হিন্দু ও খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের জন্য পৃথক পৃথক পারিবারিক আইন আছে। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে হিন্দু পারিবারিক আইন অনুসৃত হয়।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯ : ২০০৭ সালের বাংলাদেশে ২৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী নারীদের অর্ধেকের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল ১৫ বছর বয়সের মধ্যে। একই বয়সী নারীদের অর্ধেকের প্রথম সন্তান হয়েছে ১৮ বছর বয়সের মধ্যে। ১৫ বছর বয়স নাগাদ মা হয়েছে একটি বড় অংশ। (বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে, ২০০৭)

— বাল্যবিবাহ এ দেশে একটি বড় সমস্যা। এটা নিরোধের লক্ষ্যে করা আইনটি পুরোনো, কিন্তু তাতে পুরোপুরি কাজ হচ্ছে না। পারিবারিক আইনের সঙ্গে অসামঞ্জস্যের কারণে এ আইনের আওতাও এক অর্থে সীমিত হয়ে পড়ে।

— আইনটি বলছে, পুরুষেরা ২১ বছর এবং নারীরা ১৮ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগে বিয়ে করতে পারবে না। এর কম বয়সী কোনো পুরুষ বা নারীর বিয়ে হলে তার অভিভাবক বা দায়ী প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের সাজা হবে। সাজা যৎসামান্য। তদুপরি ধর্মীয় বিধানমতে বিয়ে একবার হয়ে গেলে সেটা জায়েজ থাকবে, বিবাহিতজনের বয়স যা-ই হোক না কেন। যেসব বিষয় ধর্মানুসারী পারিবারিক আইনে চলে, বিয়ে তার একটি। তবে বিয়ের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক এবং উল্লিখিত বয়সের আগে বিয়ে আইনত নিবন্ধিত হওয়ার কথা নয়। কিন্তু নিবন্ধিত না হলেও বিয়ে গ্রহণযোগ্য থাকে।

— বাল্যবিবাহ বিষয়ে নজর রাখা এবং রিপোর্ট করা যেমন জরুরি, তেমনি বয়স ও আইনের জটিলতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার জন্য এটা একটা ভালো ক্ষেত্র।

- প্রত্যন্ত, রক্ষণশীল এবং দারিদ্র্য-অধ্যুষিত এলাকায় বাড়তি নজর রাখতে হবে।

অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ১৮৯০ : এই আইনটিতে নাবালকের অভিভাবকত্ব-সংক্রান্ত বিধিবিধান আছে। যেমনটা আমার দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখেছি, এ আইনে নাবালকের বয়স ছেলে ও মেয়েভেদে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের মতো। এখানেও পারিবারিক আইনের কথা এসে পড়ে।

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ : অনেকগুলো বিষয়ে রিপোর্ট করতে গেলে শিশুর বয়স পরিষ্কার ধারণা করতে পারা দরকার।

— আপনাকে জানতে হবে, জন্মনিবন্ধনের তথ্য কোথায় কীভাবে পেতে পারেন। নিবন্ধনের কাজ স্থানীয় সরকারের। এলাকাভেদে নিবন্ধক :

✓ সিটি করপোরেশনের মেয়র বা কমিশনার।

✓ পৌরসভার মেয়র, প্রশাসক বা কমিশনার।

✓ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।

— নিবন্ধন বইয়ের তথ্যের জন্য নির্ধারিত ফি দিয়ে নিবন্ধকের কাছে আবেদন করতে পারবেন। সে তথ্য নিবন্ধককে দিয়ে সত্যায়িত করিয়ে নিতে ভুলবেন না।

— কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, জন্মনিবন্ধন এখনো যথেষ্ট প্রচলিত হয়নি। তা ছাড়া যাদের নিয়ে এখন ঘটনা ঘটছে, তাদের অনেকেরই হয়তো জন্ম নিবন্ধিত হয়নি। আপনাকে তাই জন্ম নিবন্ধনের

প্রসার ঘটাতেও প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখতে হবে। এ উদ্যোগ আখেরে আপনার বা আপনার উত্তরসূরি রিপোর্টারদের কাজে লাগবে। এমআরডিআই/ইউনিসেফের সমীক্ষায় দেখা গেছে, এ নিয়ে রিপোর্ট খুব কম হচ্ছে।

- আইনটি বলছে, এখন থেকে পাসপোর্ট, বিয়ে, স্কুলে ভর্তি, সরকারি চাকরি, গাড়ি চালানোর লাইসেন্স, ভোটার হওয়া এবং জমির নিবন্ধন করতে জন্মনিবন্ধনের প্রমাণপত্র লাগবে। এ বিধানের নানামাত্রিক তাৎপর্য ও লাভ সম্পর্কে রিপোর্ট হতে পারে।

নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০৯ : আইনটির এ সংশোধনীর ফলে এখন থেকে অবাংলাদেশি কোনো পুরুষের সঙ্গে বিবাহিত কোনো বাংলাদেশি নারীর সন্তান জন্মসূত্রে তার মায়ের, অর্থাৎ বাংলাদেশি নাগরিকত্ব পাবে। এত দিন এ রকম বৈবাহিক সম্পর্কে জন্ম নেওয়া শিশুরা তাদের বাবার নাগরিকত্ব পেত অর্থাৎ তারা বাংলাদেশের নাগরিক হতে পারত না।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ১৭ (১), ১৮, ও ২৮ নম্বর অনুচ্ছেদ : দেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানের এ অনুচ্ছেদগুলোয় যথাক্রমে বলা হয়েছে—

— গণমুখী ও সর্বজনীন এবং আইন নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সব শিশুর অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা নেবে।

— রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা নেবে জনগণের পুষ্টি ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য; মদ, মাদক ও স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজ ব্যবহার নিষিদ্ধ করার জন্য; গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য।

— রাষ্ট্র কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, লিঙ্গ ইত্যাদি কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্য করবে না এবং নারী, শিশু বা অনগ্রসর অংশের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে পারবে।

- সংবিধানের এ বিধানগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিশুর কল্যাণের প্রতি রাষ্ট্রের অঙ্গীকারের কথা বলছে। এ অঙ্গীকারগুলো পূরণ করা হচ্ছে কি না সেটা আপনার নজরদারির আওতায় অবশ্যই পড়বে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ৩১ ও ৩৯ নম্বর অনুচ্ছেদ : সংবিধানের এ অনুচ্ছেদগুলোয় নাগরিকদের এবং সংবাদমাধ্যমের এমন কিছু অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে, যা সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতার জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

— অনুচ্ছেদ ৩১-এ ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তি এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনযাপনের অধিকারের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য আলাদা করে কোনো আইন না থাকলেও সংবিধানের এ অনুচ্ছেদ সেটার কথা বলছে।

— অনুচ্ছেদ ৩৯-এ নাগরিকদের (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং (২) বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার ও সংবাদ ক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় ধারায় বলা স্বাধীনতাগুলোর কিন্তু শর্ত আছে। বলা হয়েছে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-

অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের যুক্তিসংগত বাধানিষেধ সাপেক্ষে এ স্বাধীনতা থাকবে।

প্রেস কাউন্সিল আইন, ১৯৭৪ : সংক্ষুব্ধ নাগরিকেরা সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান প্রেস কাউন্সিলের কাছে সংবাদমাধ্যমের কোনো আচরণ বিষয়ে অভিযোগ করতে পারবেন। প্রেস কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমের মালিক/সম্পাদকসহ সাংবাদিককে ডেকে এর শুনানি করবে। তবে দায়ী সাব্যস্ত হলে সংবাদমাধ্যম বা সাংবাদিককে কেবল 'হুঁশিয়ার, ভর্ৎসনা বা তিরস্কার' করা যাবে। এ আইনটির লক্ষ্য বলা হয়েছে : বাংলাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ এবং সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থার মান সংরক্ষণ ও উন্নয়ন। সাংবাদিকদের জন্য প্রেস কাউন্সিলের একটি আচরণবিধি রয়েছে। সেটা সম্পর্কে কিছু কথা পাবেন সপ্তম অধ্যায়ে।

দণ্ডবিধি, ১৮৬০ : দণ্ডবিধির যে ধারা দুটি আপনার সব সময় মনে রাখা জরুরি, তা হচ্ছে ধারা ৪৯৯ ও ৫০০। এতে কারও মানহানি বা সুনাম ক্ষুণ্ন করে কোনো কিছু প্রকাশ করলে জেল-জরিমানার বিধান আছে। ধারা ৫০০ অর্থাৎ সুনাম ক্ষুণ্ন করার জন্য দুই বছর অব্দি জেল এবং/অথবা জরিমানা হতে পারে। এ ছাড়া, ধারা ২৯২, ২৯৩ ও ২৯৪-এ অশ্লীলতাসংক্রান্ত নিষেধ ও দণ্ডের কথা আছে। এগুলোর আওতায় পড়ছে—অশ্লীল প্রকাশনা, অল্পবয়সীদের কাছে (অনূর্ধ্ব-২০) অশ্লীল বস্তু বিক্রি এবং অশ্লীল আচরণ বা গান প্রদর্শন। ২৯৫ (ক) ধারায় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের দণ্ড বিধান করা হয়েছে দুই বছর অব্দি জেল এবং/অথবা জরিমানা।

আদালত অবমাননা : আদালতের কোনো আদেশ অমান্য করলে এবং আদালত বা বিচারকের সুনাম ক্ষুণ্ন করে, হেয় করে আপনি কিছু প্রকাশ করলে সেটা হবে আদালত অবমাননা। আপনি যা প্রকাশ করছেন সেটা যদি সত্যও হয়, তবু তা আদালতের অবমাননা বিবেচিত হবে। যেকোনো মামলার রিপোর্ট করার সময় আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে, আদালতের কোনো বিশেষ নির্দেশনা আছে কি না। যেমন—মামলার বাদী, বিবাদী বা সাক্ষীদের সঙ্গে কথা বলা বা তাদের কোনো বক্তব্য প্রকাশ করার ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকলে সেটা আপনাকে মানতে হবে।

প্রসঙ্গ শিশুর বয়স

জাতিসংঘের শিশু অধিকার কমিটি তাদের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে (জুন, ২০০৯) বিভিন্ন আইন ও নীতিতে শিশুকালের বয়সে সমতা আনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

— বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন বয়সসীমার বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য সরকার উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি করেছে। এটাকে স্বাগত জানিয়ে শিশু অধিকার কমিটি জোরালো সুপারিশ করেছে যেন, সিআরসির সঙ্গে সামঞ্জস্য আনতে সরকার অনূর্ধ্ব-১৮ বছর বয়সী সবাইকে শিশু হিসেবে বিবেচনা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়। সরকারের সংশ্লিষ্ট কমিটিকে দ্রুত পর্যালোচনার জন্য ক্ষমতা অর্পণের সুপারিশও তারা করেছে। দেওয়ানী আইন, সনদ ও ধর্মানুসারী আইনে এবং ধারণায় বয়সের পরস্পরবিরোধিতার উদাহরণ দিতে গিয়ে শিশু অধিকার কমিটি বিয়ের বয়সের কথা বলেছে। এ ছাড়া, কমিটি শিশু আইন, দণ্ডবিধি, শিশু নীতি, শিশু কর্মপরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেছে। (এই বইটি প্রকাশের জন্য চূড়ান্ত করার

সময় সরকার জাতীয় শিশুনীতি ২০১০-এর খসড়া করে। সেখানে ১৮ বছরকেই শিশুকালের বয়সসীমা ধরা হয়েছে।)

— এমনিতে শিশুর বয়স প্রসঙ্গে সিআরসির প্রথম অনুচ্ছেদে আছে : 'এই সনদে ১৮ বছরের নিচে সব মানবসন্তানকে শিশু বলা হবে, যদি না শিশুর জন্য প্রযোজ্য আইনের আওতায় ১৮ বছরের আগেও শিশুকে সাবালক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।' সনদ সম্পর্কে চুম্বক প্রশ্নোত্তর দেওয়া ইউনিসেফের ওয়েবসাইটে আরও ব্যাখ্যা আছে : কিছু ক্ষেত্রে বয়সে সামঞ্জস্য রাখতে হবে—যেমন, কাজে নিয়োগের বয়স ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা সমাপনের বয়সের মধ্যে। অন্যান্য ক্ষেত্রে সনদ এ বয়সকে ওপরের দিকে রাখার প্রশ্নে অনড়—যেমন, ১৮ বছরের কম বয়সী কাউকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে না।

— এদিকে ইউনিসেফ/এমআরডিআইয়ের সমীক্ষা ও তার পরবর্তী সাংবাদিক প্রশিক্ষণের সময় কোনো কোনো আইনবিদের কাছ থেকে সর্বনিম্ন বয়স নিয়ে দ্বিমত এসেছে* ।

- দ্বিমতের একটি বড় ক্ষেত্র অপরাধের দায়িত্ব আরোপের বয়স নিয়ে। দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ৮২ নম্বর ধারা অনুযায়ী নয় বছরের কম বয়সী কারও ওপর কোনো অপরাধের দায়িত্ব দেওয়া যাবে না। নয় বছর বয়স থেকে কাউকে কোনো অপরাধের জন্য দায়ী করা যাবে। তবে ১২ বছর বয়স অব্দি কারও ওপর এ দায়িত্ব আরোপ করতে হলে বিচারককে নিশ্চিত হতে হবে যে শিশুটি তার কাজের সম্ভাব্য ফল বুঝতে পেরেছিল। বয়স ১২ হলে শিশুর ওপর নিঃশর্তভাবে অপরাধের দায়িত্ব আরোপ করা যাবে। তবে ১২ থেকে অনূর্ধ্ব-১৬ বছর বয়সী যে-কারও সম্পর্কে আইনি প্রক্রিয়া পরিচালিত হবে শিশু আইনের বিশেষ বিধানগুলো মেনে অর্থাৎ তার সর্বোত্তম কল্যাণ ও সুরক্ষার বিবেচনাকে অগ্রাধিকার দিয়ে।

- ওই আইনবিদেরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, অপরাধের দায়িত্ব আরোপের বয়স অনেকখানি বাড়ালে এ দেশের প্রেক্ষাপটে শিশুদের দিয়ে অপরাধ ঘটানোর প্রবণতা বেড়ে যেতে পারে। লক্ষণীয় যে, সনদেও এ বয়স বেঁধে দেওয়া হয়নি। শিশু অধিকার কমিটির এমন বক্তব্য আছে যে, এ বয়স ঠিক করতে হবে শিশুর সর্বোত্তম কল্যাণের বিবেচনার নির্দেশনা অনুসারে (ইউনিসেফ সিইই/সিআইএস, ২০০৭)। তবে ২০০৭ সালে পেশ করা বাংলাদেশের সর্বশেষ প্রতিবেদনের ওপরে কমিটি ২০০৯ সালে যে পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনটি দিয়েছে সেখানে এ বয়স নিয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ রয়েছে। কমিটি বলেছে অপরাধের দায়িত্ব আরোপের বয়স ইতিপূর্বের সুপারিশ অনুসারে ক্রমান্বয়ে আরও বাড়ানোকে লক্ষ্য রেখে এখন এটা কমপক্ষে ১২ বছরে উন্নীত করতে। কমিটি বাংলাদেশে বিদ্যমান শিশুর বিচার পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগের কথাও জানিয়েছে। (কমিটির প্রতিবেদনটি দেখার জন্য ওয়েবঠিকানা পাবেন পরিশিষ্ট–১য়ে তথ্যসূত্রে; দেখুন অনুচ্ছেদ ৯২-৯৪)

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ল-এর পরিচালক অ্যাডভোকেট ড. শাহ্‌দীন মালিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের চেয়ারম্যান ড. সুমাইয়া খায়ের; চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আবদুল্লাহ আল ফারুক; আইন বিশেষজ্ঞ মো. মইনুল কবির; ব্যারিস্টার তানজীব উল আলম প্রমুখ।

- আইনবিদদের কেউ কেউ আরেকটি বিষয়ে দ্বিধা প্রকাশ করেছেন। সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ অনুযায়ী আদালত উপযুক্ত বিবেচনা করলে খুব অল্পবয়সী ব্যক্তির সাক্ষ্যও আমলযোগ্য হবে। অল্পবয়সী শিশুর ক্ষেত্রে আদালত বিচার করবেন যে, তার পরিপক্ব বুদ্ধশক্তি আছে কি না অথবা সে জেরা মোকাবিলা করে বুদ্ধিসম্পন্ন গ্রহণযোগ্য জবাব দিতে পারছে কি না। এ ক্ষেত্রে বয়স ধরেবেঁধে দেওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন।
- এ ছাড়া, শ্রমে নিয়োগের বয়স বাড়ালে তার প্রয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে দ্বিধা প্রকাশিত হয়েছে।

— এদিকে শিশুর বিভিন্ন বয়স অনেক সময় আপনার জন্যও বিভ্রান্তিকর হতে পারে—যেমন, বিয়ের বয়স অথবা শ্রমে নিয়োগ সম্পর্কে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ ছাড়া আলাদা আলাদা ক্ষেত্রে শ্রমিক নিয়োগসংক্রান্ত যে আইনগুলো আছে সেগুলো দেখলে। কিন্তু বিদ্যমান আইন আপনি উপেক্ষা করতে পারবেন না। তবে কাকে শিশু হিসেবে কীভাবে দেখবেন, সে ক্ষেত্রে আপনার সুবিবেচনা বড় বিষয়। *(দেখুন, অধ্যায় ২ 'শিশু কে?')*

এ অধ্যায়ের গ. অংশে দেখব, এটা সংবেদনশীলতারও বিষয়। এ ছাড়া এটুকু বলা যায় যে, সিআরসির মূল ভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম থেকেই সংবাদ করার কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিবেচনা থেকে শিশুকালকে বিভিন্ন বয়সসীমায় ভাগ করে দেখতে হতে পারে। বিবিসি যেমন ১৫ বছরের কম বয়সীদের শিশু এবং ১৫, ১৬ ও ১৭ বছর বয়সীদের নবীন-বয়সী/অল্পবয়সী মানুষ বা ইয়ং পিপল হিসেবে গণ্য করে। **তবে আপনি সজাগ থাকুন, সর্বজনীন শিশু অধিকার ও সুরক্ষার প্রশ্নে অনূর্ধ্ব-১৮ সকলের প্রতিই বিশেষ মনোযোগী হতে হবে।**

সাংবাদিকের জন্য শিশুবিষয়ক আইনের চুম্বক তাৎপর্য

সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতার মতোই শিশুকেন্দ্রিক আইনগুলোরও ঘোষিত লক্ষ্য, শিশুর সর্বোত্তম কল্যাণ। কিন্তু কেবল আইন করে শিশুর সর্বোচ্চ কল্যাণ বিধান সম্ভব হবে না। আইনের প্রয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিছু ক্ষেত্রে কাঠামোগতসহ সুবিধা-বন্দোবস্ত না থাকায় সমস্যাটি বড়। তা ছাড়া, সব আইনের সব বিধান ভালো নাও হতে পারে।

— আপনি এ সব দিকেই নজরদারি জারি রাখবেন। দেখা গেছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাও কখনো কখনো আইনের নানাকিছু জানেন না বা মানেন না। এরপর সংবেদনশীলতা প্রসঙ্গে কয়েকটি উদাহরণে দেখব, তাঁরা অনেক সময় সাংবাদিককে আইনের নিষেধ ভাঙতে সাহায্য করেন। আইন প্রয়োগ না হওয়ার উদাহরণ অনেক মিলবে। আপনারা সময় সময় রিপোর্টও করেন। আরও নজরদারি চাই। কেননা আইন অনেকাংশে শিশুকে কাঙ্ক্ষিত সুরক্ষা দিতে, নির্যাতন থেকে বাঁচাতে বা তার অবস্থান পোক্ত করতে পারে।

— আইনের ঘাটতি বা ত্রুটি নিয়ে রিপোর্ট করার জন্য আপনাকে অন্যান্য আইনও খুঁটিয়ে জানতে হবে। যেমন, ২০০৬ সালের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে সাইবার অপরাধ

থেকে শিশুকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য কোনো বিধি নেই। আইনের ঘাটতি বা প্রয়োজনীয়তা নিয়েও রিপোর্ট হওয়া জরুরি। এরই একটি প্রক্রিয়া হতে পারে, শিশুর বয়সসীমা-সংক্রান্ত সব দিকের মতামত খতিয়ে দেখে রিপোর্ট করা।

— বিশেষ ক্ষেত্রে শিশুর নাম-পরিচয়ের সুরক্ষা দেওয়ার যে আইনগত বাধ্যবাধকতা আছে, সেটা আপনি অবশ্যই মানবেন। এ ছাড়া জটিল, খুঁটিনাটি বিষয় আছে। নিজে আইনগুলো পড়বেন। প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা উপযুক্তজনের কাছ থেকে জেনে নেওয়া জরুরি হবে; বিশেষ করে, বিচারাধীন মামলার ভিকটিম বা সম্ভাব্য সাক্ষীর সঙ্গে কথা বলার বিধিনিষেধের ক্ষেত্রে।

গ. প্রসঙ্গ সংবেদনশীলতা

ভাইবোন দুটি শিশু দা নিয়ে খেলছিল। সাত-আট বছর বয়সী ভাইয়ের দায়ের আঘাতে তিন-চার বছর বয়সী বোনটি মারা যায়। এ ঘটনাকে যদি আপনি 'ভাইয়ের হাতে বোন খুন' বলে রিপোর্ট করেন, সেটা হবে সংবেদনশীলতার অভাবের চরম একটি দৃষ্টান্ত।

রিপোর্টে সংবেদনশীলতার প্রশ্নটি সাংবাদিকতার মৌলিক নীতি-নৈতিকতার অনেকগুলো বিবেচনার সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গি জড়িত। শিশুর প্রসঙ্গ এলে সংবেদনশীলতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়।

এ সংবেদনশীলতার নানা মাত্রা আছে :

- ✓ ঘটনা বা বিষয় বোঝা—প্রকৃত খবরটি কী তা বোঝা।
- ✓ সত্য তুলে ধরা ও বিবরণে দায়িত্বশীল থাকা—সব খবরে।
- ✓ শিশু সবাই যে সমান বিবেচনা দাবি করে সেটা বোঝা।
- ✓ শিশুর সর্বোত্তম কল্যাণ কিসে সেটা বোঝা।
- ✓ শিশুর ক্ষতি বা ঝুঁকি কোথায় সেটা বোঝা।
- ✓ শিশুর সুরক্ষার প্রয়োজন বোঝা।
- ✓ ঘটনায় জড়িত শিশুর সঙ্গে কথা বলা ও তার কাছ থেকে তথ্য নিতে বিবেচনা। শোকগ্রস্ত, নির্যাতনের ভুক্তভোগী, বিপর্যস্ত ও কঠিন পরিস্থিতিতে থাকা শিশুদের বেলায় বিশেষ সতর্কতা জরুরি হবে। বাড়তি বিবেচনার দাবিদারদের মধ্যে আইনপরিপন্থী কাজে জড়িয়ে পড়া শিশু-কিশোরেরাও আছে।
- ✓ শব্দ ব্যবহার ও ছবি ছাপানোয়—সব খবরে।
- ✓ রিপোর্ট প্রকাশের পর দায়িত্বশীল থাকা।
- ✓ শিশুর আইনগত সুরক্ষার বিধান জানা এবং মানা; এর প্রয়োজনীয়তা এবং ঘাটতি বোঝা।
- ✓ নিজের মনের অযৌক্তিক ধারণা বা সিদ্ধান্ত/পূর্বসংস্কার/পক্ষপাত (প্রেজুডিস) তলিয়ে বোঝা; সেটা দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া।

এক অর্থে, নীতি-নৈতিকতার বিচারে যতগুলো করণীয় ও অকরণীয় আছে, সবগুলোর প্রতিই সংবেদনশীলতা দরকার। চতুর্থ অধ্যায়ে এবং চলতি অধ্যায়ের ক. ও খ. অংশে বিষয়গুলো ইতিমধ্যে আলোচনায় এসেছে। এখানে সমীক্ষায় চিহ্নিত হওয়া কয়েকটি সমস্যার প্রতি আপনার বাড়তি মনোযোগ চাইব। সমস্যাগুলো একটা আরেকটার সঙ্গে জড়ানো, কখনো হয়তো আমাদের পরস্পরবিরোধী মনোভাবের প্রকাশ।

— **শিশু বলে ভাবা ও না-ভাবা :** শিশুর বয়সের বিষয়টি অনেকাংশে সংবেদনশীলতার প্রশ্ন। সাধারণভাবে অনূর্ধ্ব-১৮ বছর বয়সীরা শিশু হিসেবে সুরক্ষার বিবেচনা ও অধিকার দাবি করে। আবার, কিছু বিষয়ে বয়স অনুযায়ী শিশুর চাহিদা/প্রয়োজন ও তথ্য পাওয়ার অধিকার বা মতামতের গুরুত্ব নির্ণয়ের প্রশ্ন আছে। আমরা বিভিন্ন বয়সীদের জন্য বিভিন্ন শব্দও ব্যবহার করি—শিশু, বালক-বালিকা, ও কিশোর-কিশোরী। এরা কিন্তু সবাই শিশু হিসেবে বিবেচনা দাবি করে। সচেতন না থাকলে আপনি হয়তো সে বিবেচনা দেখাবেন না। কিছু উদাহরণে শিশু সম্পর্কে লেখার ধাঁচে-ভাবে-সুরে (ট্রিটমেন্টে) ও শব্দচয়নে তেমনটাই মনে হয়েছে।

— **শিশুর মর্যাদা, আত্মসম্মান :** শিশুকে নিয়ে খবর করার সময় আপনাকে তার মর্যাদা ও আত্মসম্মানের প্রতি মনোযোগী থাকতে হবে। নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিশুর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হতে পারে। তেমনি করুণা/অনুকম্পা বা পিঠ চাপড়ানো ভাবের প্রকাশও সমস্যা করে। শেষের ঝুঁকিগুলো বেশি থাকে দারিদ্র্য, বিপর্যয় ইত্যাদির খবর এবং শিশুর কোনো কৃতিত্ব নিয়ে ইতিবাচক খবরে।

সতর্ক থাকুন, রিপোর্টে যেন এমন কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাব চলে না আসে :

✓ 'আহা বেচারা!'

✓ 'ওকে সাহায্য করুন/ভিক্ষা দিন!'

✓ 'ও বড়ই অসহায়!'

✓ 'ও কোমলমতি!'

✓ 'বাহ্! বাহ্! ও তো অনেককিছু করতে পারে!'

✓ 'ও দুধভাত!'

✓ 'ওকে ঘৃণা করুন!'

✓ 'ওকে সাজা দিন!'

✓ 'ও দুশ্চরিত্র!'

— **রিপোর্টারের মনোভাব, দোষারোপ, চটকদার করা :** রিপোর্টে পক্ষপাতশূন্যতার ঘাটতি এবং রিপোর্টারের নিজের মূল্যায়ন ঢুকে পড়তে দেখা গেছে।

✓ বেশকিছু রিপোর্টে, বিশেষ করে শিশুর অপরাধমূলক বা সমাজবিরোধী আচরণ এবং যৌন নির্যাতনের শিকার শিশু প্রসঙ্গে দোষারোপের এবং/অথবা চটকদার করার মনোভাব চলে এসেছে।

✓ চটক, চমক, চাঞ্চল্যকরতায় ঝোঁক একটি বড় সমস্যা, যা থেকে অন্যান্য সমস্যাও

তৈরি হতে পারে। চটকদার রিপোর্ট হলে সাংবাদিকতা নিজেই শিশুকে, তার ইমেজকে, বিক্রি করার দিকে ঝুঁকে পড়ে। এর পেছনে থাকে কাটতি বাড়ানোর ঝোঁক।

- ✓ অপরাধে জড়িত বা অভিযুক্ত শিশু সম্পর্কে রিপোর্টারের নেতিবাচক ধারণার (প্রেজুডিস) প্রভাব দেখা গেছে। অনেক রিপোর্টের সুরে এমন শিশুর প্রতি ধিক্কার দেখা গেছে।
- ✓ যৌন নির্যাতন বা শোষণের রিপোর্টে যৌন ইঙ্গিত এবং শিশুর সুরক্ষা বা মর্যাদাহানিকর উপস্থাপনের নজিরও আছে।

আপনি সতর্ক থাকবেন, এসব ঘটতে দেওয়া যাবে না।

— **নাম-পরিচয়, কলঙ্ক, অনিষ্ট** : আপনাকে অতিশয় যত্নবান থাকতে হবে, যেন রিপোর্টের কারণে শিশুর সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব বা তার কলঙ্ক এবং অনিষ্ট বা ক্ষতি না হতে পারে। এ বিষয়ে গুরুতর সমস্যা রয়েছে।

- ✓ সমীক্ষায় দেখা গেছে, পত্রিকার এক-তৃতীয়াংশে রিপোর্টে যৌন নির্যাতনের শিকার শিশুর বিস্তারিত ঠিকানা বা অন্য শনাক্তকরণযোগ্য তথ্য দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনেকগুলো রিপোর্টে তাদের নামও আছে।
- ✓ আইনবিরোধী কাজে জড়িয়ে পড়া শিশুদের নিয়ে পত্রিকার রিপোর্টগুলোর প্রায় এক-তৃতীয়াংশে এদের নাম দিয়েছে। অন্য শনাক্তকারী তথ্যও আছে অনেক রিপোর্টে। কিছু রিপোর্টে এমন শিশুদের ছবি দেওয়া হয়েছে। এমনকি কেবল অভিযুক্ত হলেও সে শিশুদের নাম-পরিচয় প্রকাশ করতে অনেক রিপোর্ট দ্বিধা করেনি।
- ✓ এ দুই ধরনের পরিস্থিতিতেই কোনো শিশু মারা গেলে তাকে শনাক্ত করার প্রবণতা প্রবল।
- ✓ টিভির রিপোর্টে মূল সমস্যাটি এসব নিয়ে কোনো খবর না করার। যৌন নির্যাতন বিষয়ে সেখানে কোনো রিপোর্ট ছিল না। আইনবিরোধী কাজে জড়িয়ে পড়া শিশুদের নিয়ে অল্প যেসব রিপোর্ট হয়েছে, সেগুলোয় এমন বড় ধরনের সমস্যা ছিল।

আপনি শিশুকে সুরক্ষা দেবেন এবং সংবেদনশীল হয়ে যথাযথ খবর করবেন।

— **ছাঁচে-ঢালা ধারণা** : সমীক্ষায় দেখা গেছে, শিশু সম্পর্কে ছাঁচে-ঢালা ধারণার প্রতিফলন বা চরিত্রচিত্রণের সমস্যা যথেষ্ট ব্যাপক। এর কিছু সূক্ষ্ম বা প্রচ্ছন্ন। কিছু সহজেই চোখে পড়ে। (এমআরডিআই/ইউনিসেফ, ২০০৯)

- ✓ শিশুবিষয়ক প্রতিবেদনের বড় অংশে শিশু উপস্থিত হয়েছে কেবল নিষ্ক্রিয় ভুক্তভোগীর (প্যাসিভ ভিকটিম) মতো অথবা খবরের অগুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে। সচরাচর যেসব বিষয়ে যেভাবে সোজাসাপটা রিপোর্ট করা হয় তাতে করে এটা ফুটে ওঠে। শিশু বেশির ভাগ খবরে আসছে হয় তার খারাপ কিছু ঘটলে অথবা বড়রা তাদের নিয়ে

কোনো আলোচনা, অনুষ্ঠান, গবেষণা বা কর্মকাণ্ড আয়োজন করলে, কিছুর ঘোষণা দিলে।

- ✓ এসব রিপোর্টে শিশুর মতামত খোঁজা হচ্ছে না, তাকে নিজের জোরে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে না। এ প্রবণতা ছাড়িয়ে উঠতে আপনাকে বিশেষ সচেষ্ট থাকতে হবে। রিপোর্টের বিষয় বাড়ানোর সময়ও আপনাকে শিশুর স্বতন্ত্র স্বকীয় ভূমিকার দিকে নজর রাখতে হবে।
- ✓ অপরাধে জড়িয়ে পড়ার খবরে ছেলেরা বেশি এসেছে। মেয়েরা বেশি এসেছে নির্যাতনের শিকার হিসেবে। আপনি খোঁজ করলে দেখবেন, উল্টোটাও কিন্তু ঘটে।
- ✓ শিশুদের কোনো কোনো গোষ্ঠী, যেমন পথশিশু সম্পর্কে ঢালাও নেতিবাচক ধারণা দেওয়ার প্রবণতা আছে।

—**ইতিবাচক খবরে সতর্কতা চাই :** সমীক্ষায় দেখা গেছে, মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষায় ভালো ফল করা দরিদ্র শিক্ষার্থীদের খবর সংবাদপত্র বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরছে। এটা অবশ্যই ইতিবাচক—শিশু-কিশোরদের সামনে ভালো দৃষ্টান্ত ও আশার চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে। কিন্তু প্রতিবেদনগুলো অনেক সময় দরিদ্র শিক্ষার্থীদের অর্জনের চেয়ে তাদের দারিদ্র্যকে বেশি ফুটিয়ে তুলেছে। তাদের মর্যাদার দিকটিতে সব সময় হয়তো মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে না। কখনো সরাসরি সাহায্যের জন্য হাত পাতার মতো করে এদের পরিস্থিতি দেখানো হচ্ছে।

অনিচ্ছাকৃতভাবে পরোক্ষে এমন ভাবও ফুটে উঠতে পারে যে, দরিদ্র হলে ভালো ফল করার কথা নয়। বিশেষ কোনো প্রতিবেদন এমন দৃষ্টিভঙ্গি ফুটিয়ে তুলতে পারে, আবার সবগুলো প্রতিবেদনের সম্মিলিত প্রভাব এমন ধারণা জাগাতে পারে। একটি ছাঁচে-ঢালা চরিত্রচিত্রণ তৈরি হয়ে যায়।

- ✓ এজাতীয় প্রতিবেদনে সূক্ষ্ম ভারসাম্য চাই। আপনার রিপোর্ট সমমর্মী হবে কিন্তু তাকে করুণা বা অনুকম্পা করবে না।
- ✓ এ ছাড়া সতর্ক থাকুন, যেন শিশুর কৃতিত্ব নিয়ে খবরগুলোয় শিশুর প্রতি বাহবা বা পিঠ-চাপড়ানোর ভাব চলে না আসে।

—**মানবিক প্রেক্ষাপট ও সতর্কতা :** রিপোর্টে ঘটনার মানবিক প্রেক্ষাপট বা হিউম্যান ইন্টারেস্ট উপাদান প্রয়োজন। ঘটনায় জড়িত মানুষজনের মুখের কথা, তাদের অভিজ্ঞতা ও পরিস্থিতি তুলে ধরলে, মানুষজনকে জীবন্ত করে মানবিক দিক ফুটিয়ে তুললে রিপোর্ট এই উপাদানে সমৃদ্ধ হয়। মানবিক প্রেক্ষাপট রিপোর্টকে সহজেই অর্থবহ করতে পারে, রিপোর্টের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বাড়িয়ে দেয়। এটাকে কিন্তু 'আবেগ' আনার বিষয় বা ফেনিয়ে তোলার বিষয় বলে ভাবলে চলবে না। মানবিক প্রেক্ষাপট খুব শক্তিশালী একটি উপাদান। কিন্তু ঠিকভাবে ব্যবহার না করলে এটা রিপোর্টকে জোলো, কাঁদুনে, ভাবাবেগে আবিল করে তুলতে পারে। অন্যদিকে, মানবিক প্রেক্ষাপট আনতে গিয়ে শিশুর ভাবমূর্তি বিক্রি করে পাঠকের কাছে আবেদন সৃষ্টির চেষ্টা না করতে সতর্ক থাকবেন।

— **বীভৎসতা, সহিংসতা, সন্ত্রাস :** সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, যখনই ঘটনার মধ্যে এমন উপাদান থেকেছে অনেক সংবাদমাধ্যম সেটার ফায়দা নিতে চেষ্টা করেছে। যেকোনো রিপোর্ট করার সময় মনে রাখবেন যে, শিশুরাও এটা পড়বে/দেখবে/শুনবে। রিপোর্টে বীভৎসতা, সহিংসতা, সন্ত্রাস, সমাজবিরোধী কাজের বিশদ বিবরণ থেকে থেকে শিশুর আতঙ্ক, বা এসব সম্পর্কে ভোঁতা হয়ে যাওয়া, অথবা অনুকরণের আশঙ্কা মনে রাখবেন।

— **ছবি, শব্দ ও সুর :** ওপরে বলা সমস্যাগুলো দূরে রাখতে হলে প্রথমত আপনাকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করে সঠিক অবস্থানটি নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া আপনাকে ছবি, শব্দ ও ভাষা এবং সেসব দিয়ে গাঁথা রিপোর্টের সুরের প্রতি নজর রাখতে হবে। একটি সাধারণ সতর্কতা হচ্ছে, বিশেষণ ও মূল্যায়নধর্মী যেকোনো শব্দ এড়িয়ে চলা। আর সতর্ক থাকবেন আবেগাপ্লুত না হতে।

সমীক্ষায় পাওয়া কিছু উদাহরণ থেকে সতর্কতার ক্ষেত্রগুলো বুঝতে চেষ্টা করা যাক।

নীতিগত কারণে এমন ছবি ছাপানো যায় না

লাশের ছবি—২০০৯ সালের শেষদিকে একটি লঞ্চডুবির পর উদ্ধার করা এক শিশুর লাশের রঙিন ছবি কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়। দুর্ঘটনার দু-তিন দিন পরে উদ্ধার করা লাশ। একজন ডুবুরির হাত থেকে ঝুলে ছিল। অত্যন্ত নিষ্ঠুর একটি ছবি। বড় যেকোনো দুর্ঘটনার পর কিছু সংবাদমাধ্যমে, বিশেষ করে টিভিতে, লাশের ছবি দেখানোর একটা রেওয়াজ রয়েছে।

সমীক্ষার নমুনার মধ্যে মৃতদেহের আরও বেশ কয়েকটি ছবি ছিল। এক ব্যক্তি ধারাবাহিকভাবে অল্পবয়সী নারীদের ধর্ষণের পর হত্যা করার স্বীকারোক্তি করেছেন বলে সংবাদমাধ্যমগুলো কয়েক দিন ধরে অনেক ছবিসহ বড় বড় রিপোর্ট করে। তখন তাঁর হাতে নিহত বলে কথিত তিনটি মেয়ের বিকৃত মুখের ছবি বেশকিছু সংবাদমাধ্যমে আসে। এ ছবিগুলো সম্ভবত পুলিশের ফাইল থেকে পাওয়া। এঁরা মারা গিয়েছিলেন বেশ আগে। এত দিন পর এভাবে এ ছবিগুলো দেখে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের কেমন লাগবে, সেটা যেমন ভাবা হয়নি, তেমনি মৃত ওই মেয়েদের মর্যাদার বিষয়টিও সংবাদমাধ্যমগুলো মনে রাখেনি। ছবিগুলো শিশুদের দেখতে কেমন লাগবে সে কথা ভাবা হয়নি।

নৃশংস, বীভৎস—বেশকিছু ছবি পাওয়া গেছে—সবই রঙিন—যেগুলো গণপিটুনি, সহিংসতার ফলে নিহত মানুষজন, রক্তাক্ত ক্ষত বা আঘাতের স্থানগুলো বড় করে দেখাচ্ছে। অনেক সময় রক্ত বোঝাতে বাড়তি লাল রঙের ছোপ পড়েছে। এ ছবিগুলো প্রায় সবই ছিল একেবারে প্রথম পাতায়—অর্থাৎ পত্রিকাটি হাতে নিলেই এসব শিশু পাঠকের চোখে পড়বে।

এমন ছবি সংবাদমাধ্যমে দেখানো যায় না—কখনো যদি ঘটনার নৃশংসতা বোঝানোর জন্য দেখাতে চান, তা হলে অবশ্যই সঙ্গে সম্পাদকীয় নোট দিয়ে আপনার যুক্তি পরিষ্কার করে জানাবেন। এমন ঘটনা রোজ ঘটে না, সব সংবাদমাধ্যম এগুলো প্রকাশও করে না। কিন্তু ঘটনা ঘটলে, এমন ছবি দেখানোর সুযোগ থাকলে, একটা বড়সংখ্যক সংবাদমাধ্যম সে সুযোগ ছাড়েনি। **মনে রাখা ভালো যে, এমন একটি ছবিও শিশুর ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।**

নৃশংস, সহিংস, দায়িত্বজ্ঞানহীন

পুলিশের সহায়তায়—ভয়াবহতা ও নৃশংসতা সবচেয়ে স্পষ্ট হয় ছবিতে। তবে সংবাদের বিবরণে বা সুরেও এর নগ্ন প্রকাশ ঘটতে পারে। বিবরণ ও ছবিতে একযোগে এর প্রকাশ সবচেয়ে ক্ষতিকর হয়।

২০০৯ সালে একটি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলে প্রচারিত একটি রিপোর্টে বলা হয় যে, এলাকায় শিশু-কিশোরেরা হত্যাসহ নানান অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। তারপর একটি শিশুর লাশের ছবি দেখিয়ে জানানো হয় যে, তাকে খুন করেছে চারজন পথশিশু। সংবাদে বলা হয় এদের পুলিশ আটক করেছে। হত্যাকারী পথশিশু হিসেবে চিহ্নিত করে ১১/১২ বছর বয়সী এ শিশুদের ভীত-বিচলিত চেহারা ছবিতে দেখানো হয়। একটি শিশু অভিযোগ অস্বীকার করতে চাইলে নেপথ্যের একটি কণ্ঠস্বর তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয়। তারপর এদের একজনকে শুইয়ে আরেকজনকে বলা হয় অভিনয় করে দেখাতে যে, কীভাবে তারা নিহত শিশুটিকে জবাই করেছে। সে পুরো দৃশ্য দর্শককে দেখানো হয়। হত্যাকাণ্ডটিকে 'চাঞ্চল্যকর' বলা হয়। ছবি এবং বিবরণের ঢালাও ও উচ্চকিত সুর মিলিয়ে সংবাদটি বিশেষভাবে হানিকর হয়েছে। পথশিশুরা হত্যা করে, এমন ধারণাও তৈরি হয়ে যায়।

বোঝাই যাচ্ছে যে, পুলিশ তাদের হেফাজতে থাকা ওই শিশুদের ক্যামেরার সামনে হাজির করেছে। কিন্তু পুলিশ অদায়িত্বশীল হলেও সাংবাদিক তা হতে পারেন না।

ছাঁচে ঢেলে দেখানো, চটকদার, দায়িত্বজ্ঞানহীন

বিশেষণ ও বর্ণনা—সমীক্ষাটি বিভিন্ন রিপোর্টে শিশু সম্পর্কে যেসব বিশেষণ বা বর্ণনা পেয়েছে তার কয়েকটি নমুনা :

- ✓ 'অসহায়', 'কোমলমতি', 'হতদরিদ্র', 'নিষ্পাপ', 'পাষণ্ড', 'টোকাই', 'শারীরিক বিকৃত শিশু' (প্রতিবন্ধী বোঝাতে), ষোড়শী (যৌন নির্যাতন/নিপীড়নের রিপোর্টে)। যৌন হয়রানির শিকার একটি মেয়ে সম্পর্কে লেখা হয়, 'চঞ্চলা কিশোরী'। **নিজে ভেবে এমন শব্দের একটি তালিকা করুন এবং সেগুলো এড়িয়ে চলুন।**

- ✓ উলঙ্গ করে ধর্ষণ করা হয়েছে—এ তথ্যটি অনেক রিপোর্টে থাকে। ধর্ষণ প্রসঙ্গে প্রায়ই 'জোরপূর্বক' শব্দটি লেখা হয়। মনে প্রশ্ন জাগে, ধর্ষণ কি তা হলে কারও স্বেচ্ছায় হতে পারে? 'রাতভর ধর্ষণ', 'পালাক্রমে ধর্ষণ', 'উপর্যুপরি ধর্ষণ'—এগুলো আরও কিছু শব্দ যা যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় ও চটকদার। এসব শব্দ এবং নির্যাতনের বিশদ বর্ণনা রিপোর্টে যৌন আবেদন সৃষ্টির শামিল। শিশুকে এভাবে উপস্থাপন করলে তাকে যৌনবস্তু হিসেবে দেখানো হয়ে যেতে পারে। **নিজে ভেবে এমন শব্দের একটি তালিকা করুন এবং সেগুলো এড়িয়ে চলুন।**

নিরাপত্তা উপেক্ষিত—সমীক্ষায় দেখা গেছে, রিপোর্টগুলোর একটা বড় অংশে শিশুর নিরাপত্তা, হেফাজত বা কল্যাণের কথা ভাবেনি :

- ✓ স্কুলে শিক্ষকের হাতে লাঞ্ছিত শিশুকে যখন রিপোর্টে নাম-পরিচয় দিয়ে শনাক্ত করে তার

অভিযোগ তুলে ধরা হয়, তখন তার বিড়ম্বনার ঝুঁকি বাড়ে।

- ✓ যৌন নির্যাতনের অনেকগুলো রিপোর্টে শিশুর বাবা-মায়ের নাম, গ্রামের নাম ও মোটামুটি চিহ্নিত করার মতো ঠিকানা, স্কুলের নাম, সে কোন ক্লাসে পড়ে, ইত্যাদি তথ্য ছিল। কিছু রিপোর্টে অতীতের ঘটনা প্রসঙ্গে নাম-পরিচয় দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

- ✓ সাধারণভাবে দেখা গেছে, যৌন নির্যাতনের শিকার শিশু মারা গেলে তার নাম-পরিচয় প্রকাশ করতে সংবাদকর্মীরা দ্বিধা করেন না। আপনাকে কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, মৃত শিশুরও মর্যাদার প্রশ্ন আছে। তা ছাড়া, তার ঘরে অল্পবয়সী ভাইবোন আছে, বাবা-মার আহত হওয়ার ঝুঁকি আছে। তাঁদের পরিষ্কার সম্মতি ও ঝুঁকির বিবেচনা না করে আপনি স্পর্শকাতর ঘটনায় মৃত শিশুকে রিপোর্টে পরিচিত করতে পারেন না।

ধর্ষণকারীর প্রতি অন্যায্যতা—একটি রিপোর্টের কথা আলাদাভাবে শিক্ষণীয় হবে। ধর্ষণের অভিযোগে দায়ের করা একটি মামলার সুবাদে প্রথম দিনই বেশকিছু পত্রিকা অভিযুক্ত একজন বড় কর্মকর্তার ছবিসহ রিপোর্ট করে। একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল 'কিশোরী ধর্ষণের অবিশ্বাস্য ঘটনা'। যে মেয়েটিকে তিনি ধর্ষণ করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়, তাকে শনাক্ত করার মতো যথেষ্ট তথ্য রিপোর্টে ছিল। এ ছাড়া অভিযুক্ত ব্যক্তির সন্তানদের নাম, তারা কোথায় কী পড়ে/করে—সেসব তথ্যও দেওয়া হয়। পরে অভিযোগটির কোনো ভিত্তি প্রমাণিত হয়নি। অভিযুক্ত ব্যক্তি ও তাঁর পরিবারের সুনামের যা ক্ষতি হয়ে গেছে তা কিন্তু আর ফিরবে না।

ইন্টারনেটে হদিস—একটি মেয়েকে ধর্ষণ করার সময় ছবি তুলে সেটা সিডিতে বিক্রি করা এবং ইন্টারনেটে তুলে দেওয়া হয়েছিল বলে রিপোর্ট করা হয়। কিছু রিপোর্টে ওয়েবসাইট/ফাইলের নাম ছিল।

পথশিশুদের নেশা ও মাদকাসক্তির সহজপাঠ—মাদকাসক্তি নিয়ে বেশ কয়েকটি রিপোর্ট চোখে পড়েছে, যেখানে বিশেষ কোনো নেশা করার পদ্ধতি, এটা করলে কেমন লাগে এবং কোথায় এ মাদক পাওয়া যায় তার বিশদ তথ্য ছিল।

- ✓ সংবাদপত্রের একটি ছবিতে দেখা যায়, একদল ছোট শিশু বসে সিগারেট টানছে। পুরো ছবির মধ্যে একটা লাগামছাড়া ফুর্তির আমেজ আছে।

- ✓ আরেক ছবিতে কয়েকটি শিশুকে দেখা যায় আঠা (গ্লু) শুঁকে নেশা করতে। রিপোর্টে বিস্তারিত ও ঢালাও বর্ণনা ছিল—এ নেশা করলে কেমন আমোদ হয়, কোথায় কোথায় এটা পাওয়া যায়। এই শিশুদের পথশিশু হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদের রিপোর্টে 'কোমলমতি' বলা হয়েছে, কিন্তু তাদের নাম ধরে পরিচিতি ও চরিত্রচিত্রণ ঢালাওভাবে নেতিবাচক হয়েছে।

এসব ছবি ও বিস্তারিত বর্ণনা অন্য শিশুদের এমন কাজ করতে আকৃষ্ট করতে পারে।

সহানুভূতির ছদ্মবেশে—একজন শিশু যৌনকর্মীকে নিয়ে লেখা রিপোর্টে তার ছবি এবং কাজের বিশদ বিবরণ ছাপা হয়েছে। রিপোর্টটি আপাতদৃষ্টিতে সহানুভূতির সঙ্গে লেখা। কিন্তু রিপোর্টার নিজের আবেগকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে একদিকে প্রচুর ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন, অন্যদিকে ওই

শিশুর স্বার্থ দেখতে ভুলে গিয়েছেন। তাকে এমনভাবে চিহ্নিত করে দিয়েছেন যে, পাঠক যে-কেউ মেয়েটিকে খুঁজে বের করতে পারবেন। কেউ তাকে বের করে ব্যবহার করতেও প্রলুব্ধ হতে পারেন।

টোকাই, খুনি, অপরাধী

টোকাইরা অপরাধী—যেসব শিশু রাস্তায় থাকে বা কাজ করে, সংবাদে প্রায়ই তাদের 'টোকাই' বলে চিহ্নিত করা হয়।

- ✓ টোকাই শব্দটির ভাবার্থ ভালো নয়। এটা বললে ছন্নছাড়া, আবর্জনা কুড়োনোর ধারণা মনে ভেসে ওঠে। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যও প্রকাশ পায়। এ শিশুরা কোনো আইনপরিপন্থী কাজে জড়িত হলে 'টোকাই' শব্দটি অনেক ব্যবহৃত হয়। এতে করে এ শিশুদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণাও প্রসার পায়।

- ✓ পত্রিকার এক রিপোর্টে একটি ১৭ বছরের ছেলেকে ভাড়াটে খুনি হিসেবে পরিচিত করা হয়। এর শিরোনাম ছিল 'পিচ্চি সন্ত্রাসী (নাম) : আমার রেট খুব কম'। রিপোর্টে বলা হয় 'উঠতি বয়সের সন্ত্রাসী'দের তৎপরতা বাড়ছে। উত্তেজিত, চাঞ্চল্যকর সুরে এ ছেলেটি খুন করতে কত কম টাকা নেয়, সে কতটা বেপরোয়া—এসব কথা বিশদ লেখা হয়। 'পিচ্চি সন্ত্রাসী (নাম)' এবং 'উঠতি বয়সের সন্ত্রাসী'-এ দুটি কথা বহুবার রিপোর্টে এসেছে।

  রিপোর্টে ছেলেটির নাম ও ছবি তো ছিলই, তার বাবার নাম ও তিনি কী করেন, তাদের নিবাস—ইত্যাদি বিশদ তথ্য টেনে আনা হয়। রিপোর্টটি পড়লে বোঝা যায়, এটা মূলত ছেলেটিকে আটককারী র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন বা র‍্যাবের সদস্যদের দেওয়া তথ্য ও বক্তব্যের ভিত্তিতে লেখা।

  রিপোর্টের মধ্যে এক জায়গায় তির্যক সুরে লেখা ছিল, ছেলেটি বলেছে তার কোনো সমস্যা হয় না। সে 'বড় ভাইয়া'দের নির্দেশে হত্যা করে এবং ভাইয়ারাই সব সময় তাকে পুলিশের কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনে। এ রিপোর্টে অনুসন্ধান এবং দেখার বিষয় ছিল এ দিকটি।

পুলিশ সুযোগ দিলেও নেবেন না—আপনার জন্য সাধারণ করণীয়, কেবল কোনো আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে রিপোর্ট করবেন না। তারা নাম, ছবি ইত্যাদি তথ্য জোগালেও আপনি ঝুঁকিপূর্ণ/স্পর্শকাতর বিষয়ে সেগুলো প্রকাশ করবেন না।

কঠিন পরিস্থিতি

বিভিন্ন পত্রিকার একটি রিপোর্টে বুকে নাম ঝোলানো তিনটি কিশোরের ছবি প্রকাশিত হয়। পুলিশ এ ছবি তোলার সুযোগ করে দিয়েছে। রিপোর্টে বিস্তারিত জানানো হয়েছে, এই তিন কিশোর সমবয়সী আরেক কিশোরকে হত্যা করেছে।

- ✓ শিশু যখন অন্য শিশুকে হত্যা করে, ধর্ষণ করে অথবা কিশোরের উত্ত্যক্ত করার কারণে কিশোরী যখন আত্মহত্যা করে—সে ঘটনার রিপোর্ট নৈতিকতা মেনে করতে গেলে আপনাকে অভিযুক্ত শিশুর সুরক্ষার কথাও ভাবতে হবে। কিন্তু এ কাজ সহজ নয়। আপনার নিজেরও মনে হতে পারে যে, এরা কঠোর সাজার যোগ্য।

✓ কিশোরীকে উত্ত্যক্ত করার ঘটনার রিপোর্টে সব সময় উত্ত্যক্তকারীকে 'বখাটে' হিসেবে ধিক্কৃত করা হচ্ছে। কিন্তু একবার ভেবে দেখুন, এই কিশোরদের ধিক্কার বা সাজা দিলেই কি সমস্যা মিটবে? বরং তাদের আরও বেশি করে গুরুতর সমাজবিরোধী আচরণের দিকে ঠেলে দেওয়া হতে পারে। এসব ঘটনার শেকড় সমাজের পরিবেশে। সেদিক খতিয়ে দেখে রিপোর্ট করা দরকার।

আত্মহত্যা

ছেলেদের দ্বারা উত্ত্যক্ত হয়ে শিশু-কিশোরীদের আত্মহত্যার খবরে অনেক সময় দায়িত্বশীলতার পরিচয় থাকে না। ছবির ক্যাপশনে, সংবাদের শিরোনামে, সূচনায় বা ভেতরের বিবরণে এমন বাক্য আমরা দেখি :

'বখাটেদের উৎপাতে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হলো কিশোরী।' অনেক সময় রিপোর্টের সুরে মেয়েটির অসহায়ত্ব, তার বিপন্নতার দিকটি এমনভাবে তুলে ধরা হয় যে ওই অবস্থায় পড়ে আরেকটি মেয়েরও মনে হতে পারে, আত্মহত্যাই একমাত্র উপায়। রিপোর্টের এমন কোনো সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে আপনাকে সজাগ থেকে বিবরণে এমন ঝোঁক ছেঁটে বাদ দিতে হবে।

ধর্ষণের শিকার এবং অপরাধমূলক কাজে জড়িত/অভিযুক্ত শিশু

কয়েকটি চুম্বক পরামর্শ :

— তার ছবি দেবেন না। মুখ ঝাপসা করে কোনো ছবি যদি ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত মনে হয়, খেয়াল রাখবেন, ছবির অন্য অংশের কোনোকিছু থেকে যেন স্থান শনাক্ত করা না যায়।

— তার নাম বা তাকে শনাক্তকরণযোগ্য কোনো তথ্য রিপোর্টে দেবেন না।

✓ ঘটনা তুলে ধরার জন্য অত্যাবশ্যক না হলে গ্রামের নামও দেবেন না। থানা, বড় জোর ইউনিয়ন পর্যন্ত বলুন। ছোট শহরে অঞ্চল বা পাড়া না বলে দিকপরিচয় (উত্তর/পশ্চিম) বা থানার নাম দেবেন।

✓ বাবা-মা, কোনো নিকটাত্মীয়, নিকট প্রতিবেশী—কারও নাম দেবেন না।

✓ রিপোর্টের বিষয়ের জন্য অত্যাবশ্যক না হলে স্কুলের নাম দেবেন না। কোন ক্লাসে পড়ে সেটা কখনোই দেবেন না। বয়স বলতে পারেন।

✓ সতর্ক থাকুন, টুকরো টুকরো তথ্য জুড়ে যেন পরিচয় বেরিয়ে না পড়ে।

— সে যদি মারা গিয়ে থাকে তখনো তাকে শনাক্ত করা উচিত নয়, বিশেষ করে ধর্ষণের শিকার শিশুকে।

— তার সঙ্গে কথা বলার সিদ্ধান্ত নেবেন খুব ভেবেচিন্তে। তার জন্য এর তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব/প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করবেন।

- ✓ কথা বলার সময় তার স্বার্থ দেখবেন বা তাকে আস্থা জোগাবেন, এমন কোনো বড় ব্যক্তিকে সঙ্গে রাখা ভালো হবে।
- ✓ কথা বলবেন সংবেদনশীল হয়ে।
- ✓ বিশেষ করে, ধর্ষণের শিকার শিশুর নাজুক মানসিক অবস্থা মনে রাখবেন।
- ✓ প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেবেন।

— ধর্ষণের অভিযোগটির সত্যতা সম্পর্কে প্রাথমিক নিশ্চয়তা না হলে অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম দেবেন না। অভিযুক্ত ব্যক্তি শিশু হলে তাকে শনাক্ত করবেন না।

— রিপোর্টে আইনি প্রক্রিয়া ও বিচারের বিষয়ে নজর রাখবেন।

— ধর্ষণের শিকার শিশুর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সতর্ক থাকবেন :

- ✓ যেন তার প্রতি অপবাদমূলক কোনো শব্দ বা ধারণা রিপোর্টে না ঢোকে।
- ✓ বিবরণ যেন কোনোভাবে তাকে দায়ী করার ইঙ্গিত না দেয়।
- ✓ রিপোর্টে যেন যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ শব্দ, বর্ণনা বা সুর না থাকে।

— অপরাধমূলক কাজে জড়িত/অভিযুক্ত শিশুর ক্ষেত্রে :

- ✓ তাকে 'অপরাধী' হিসেবে ভাববেন না। তার সম্পর্কে 'অপরাধী' বা 'সাজা'-জাতীয় শব্দ ব্যবহার করবেন না। আপনি লিখতে পারেন : 'আইনপরিপন্থী বা সমাজবিরোধী কাজে জড়িত'; 'অপরাধমূলক কাজে জড়িত বা অভিযুক্ত'; অথবা যে কাজটা নিয়ে কথা হচ্ছে এবং যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সোজাসাপটা সরাসরি সেটা।
- ✓ দোষারোপ, ধিক্কার বা ধমক দিয়ে কথা বলবেন না। তবে তার কাজটির গুরুত্ব হালকা করেও দেখাবেন না।
- ✓ তার পরিবেশ-পরিস্থিতি বুঝতে চাইবেন, তাকে বুঝতে চাইবেন।
- ✓ কেবল পুলিশ বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী অথবা কোনো সংস্থার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে রিপোর্ট করবেন না।

— বিশেষভাবে সতর্ক থাকুন, যখন কোনো শিশু আরেকটি শিশুর বিরুদ্ধে নির্যাতন/অপরাধ করেছে। উভয় পক্ষের প্রতিই যথাযোগ্য ন্যায্য হবেন।

দুই ধরনের পরিস্থিতিতেই আপনার লক্ষ্য থাকবে জড়িত শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ সংরক্ষণ এবং তার ক্ষতি আর না বাড়ানো। আপনাকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে বিচারাধীন মামলার বেলায়, আদালত অবমাননা বা মিডিয়া ট্রায়াল যেন না হয়ে যায়।

ঘ. শিশুদের চোখে সংবাদ

এমআরডিআই-ইউনিসেফের সমীক্ষার আওতায় ১২ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিশুদের দুটি দলগত আলোচনা (এফজিডি) অনুষ্ঠিত করা হয়েছিল। আলাদা দুটি আলোচনায় মধ্যবিত্ত পরিবারের এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা অংশ নেয়। তারা দীর্ঘ সময় ধরে তাদের জন্য জরুরি বিষয়গুলো নিয়ে সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত খবর সম্পর্কে আলোচনা করেছে। তারা বলেছে, তারা নিয়মিত পত্রিকা পড়ে এবং টিভির খবর দেখে, বিশেষ করে সেখানে শিশু সম্পর্কে কিছু থাকলে।

দুই দলের আলোচনাতে কিছু সাধারণ ধারণা ও প্রত্যাশার কথা উঠে আসে। আবার, নিজ নিজ অবস্থান থেকে বিশেষ কিছু চাহিদার কথাও তারা জানিয়েছে। তাদের আলোচনায় সাধারণ যেসব সিদ্ধান্ত হয়েছিল তার কয়েকটি এখানে দিচ্ছি। এগুলো আপনার জন্য চিন্তার খোরাক ও দিকনির্দেশনা জোগাবে। দুই ভিন্ন অবস্থার শিশুদের সাধারণ চাহিদা বা ধারণাগুলো লক্ষ করুন।

সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের কথা

দলগত এ আলোচনায় অংশ নিয়েছিল ঢাকা শহরের ১০ জন পথশিশু। তারা একটি এনজিওর আশ্রয়কেন্দ্রে থাকে। আলাপ-আলোচনার পর তারা যেসব ব্যাপারে মোটামুটি একমত হয়েছে, তার মধ্যে আছে :

— পত্রিকায় ও টিভিতে শিশুদের ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট রিপোর্ট থাকে না।

— পত্রিকা বেশিরভাগ সময় শিশুদের খারাপ কাজ বা অপরাধ নিয়ে রিপোর্ট করে। যেমন, পথশিশুরা যখন চুরি বা ছিনতাই করে সেটা নিয়ে রিপোর্ট হয়। শিশুরা সচরাচর নানা কারণে বাধ্য হয়ে এ ধরনের ছোটখাটো অপরাধ করে। একটা বড় কারণ দারিদ্র্য। সুতরাং রিপোর্টে শুধু অপরাধটা বর্ণনা করলে চলবে না। সাংবাদিকের উচিত, কেন শিশুরা অপরাধে জড়িয়ে পড়ে তা খোঁজ করা এবং যেসব বড় মানুষজন শিশুদের দিয়ে এসব কাজ করায় তাদের কথা রিপোর্টে লেখা।

— যেসব বিষয়ে রিপোর্ট পড়লে মনে ধাক্কা লাগে এবং মন খারাপ হয় : মেয়েদের অ্যাসিড মারা; শিশুদের ধর্ষণ, অত্যাচার, নির্যাতন, মারধর, জোরজুলুম, ঠকানো বা শোষণ; নেশার জিনিস বিক্রি ও নেশা করা; শিশুশ্রম; বাসাবাড়িতে কাজ করা শিশুদের ওপর অত্যাচার; শিশুদের চিকিৎসা না পাওয়া; পথশিশুদের খবর। কিন্তু এসব বিষয়ে যথেষ্ট রিপোর্ট হয় না। সাংবাদিকেরা অনেক সময় শিশুদের ওপর নানান নির্যাতন বা মারধর-অত্যাচারের খবর চাপা দিয়ে দেন।

— শিশুদের এসব দুঃখকষ্ট-সমস্যার খবর করার পাশাপাশি সাংবাদিকদের উচিত শিশুদের ভালো কাজ এবং তাদের নিয়ে ভালো ঘটনা, আনন্দের ঘটনার কথা রিপোর্ট করা। তাঁরা এমনভাবে সেসব রিপোর্ট করবেন, যাতে শিশুদের মধ্যে আশা জাগে এবং যারা ভুল পথে যাচ্ছে অথবা যারা কঠিন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে তারা যেন অপরাধ, মারামারি আর খারাপ কাজে না যেতে উৎসাহিত হয়।

— কোনো শিশু সম্পর্কে সাংবাদিকের এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করা উচিত নয়, যাতে শিশুটিকে হেয় করা হয়। যেমন, পথশিশুকে 'টোকাই' বলা ঠিক না। কেউ 'টোকাই' হয়ে জন্ম নেয় না।

— টিভির খবরে খুন আর শিশুপাচারের দৃশ্য দেখলে মন খুব খারাপ হয়। কাগজে বা টিভিতে ভয়াবহ দৃশ্য বা রক্তারক্তির ছবি দেখানো উচিত নয়। (দু-একজন অংশগ্রহণকারী বলেছে, ভয়ানক খারাপ কাজকর্ম কিছুটা পর্যন্ত দেখানো যেতে পারে; তাতে অন্যরা এসব খারাপ কাজের পরিণতি বুঝতে পারবে এবং এগুলো করা থেকে পিছিয়ে যাবে।)

— রিপোর্ট সব সময় বিশ্বাস হয় না। নিজেদের সরাসরি জানা ঘটনা অনেক সময় ভুলভাবে রিপোর্টে আসে। তা ছাড়া, শিশুদের নিয়ে করা রিপোর্টে প্রায়ই কিছু ঘাটতি থাকে। যেমন, কিছু রিপোর্টে তথ্য খাপছাড়া মনে হয়। অনেক সময় রিপোর্ট সবটুকু তথ্য দেয় না। মনে প্রশ্ন রয়ে যায়। এমন মনে হয় যে, রিপোর্টারেরা শুধু দু-একজন মানুষের সঙ্গে কথা বলে রিপোর্ট লেখেন। ভেতরের কথা বা অর্থ বোঝা যায় না। ভাসা ভাসা রিপোর্ট না করে তাদের উচিত খবরের পেছনের ঘটনাও জানানো।

তুলনামূলকভাবে সুবিধাভোগী শিশুদের কথা

দলগত এ আলোচনায় অংশ নিয়েছিল ঢাকা ও গাজীপুর শহরের ১০ জন শিশু। আলাপ-আলোচনার পর তারা যেসব ব্যাপারে মোটামুটি একমত হয়েছে, তার মধ্যে আছে :

— পত্রিকা আর টিভির সংবাদে রাজনীতির খবর এবং বিভিন্ন দল, নেতা-নেত্রী অথবা প্রধানমন্ত্রীসহ বড় বড় মানুষদের কথা বেশি থাকে। শিশুদের বিষয়গুলো খুব কম স্থান পায়। এটা থেকে বোঝা যায় যে, বড়রা শিশুদের গুরুত্ব দেন না অথবা শিশুদের জন্য জরুরি বিষয়গুলো সম্পর্কে জানেন না। এদিকে, দেশে শিশুদের সংগঠন বা শিশুদের নিয়ে কর্মকাণ্ডও বিশেষ নেই। থাকলে হয়তো সাংবাদিকেরা শিশুদের নিয়ে রিপোর্ট করতেন।

— চারপাশে কী ঘটছে সেগুলো সম্পর্কে শিশুদের জানা দরকার। তাদের জন্য জরুরি বিষয়গুলো সম্পর্কে তাদের সজাগ করা জরুরি। যেসব বিষয় মিডিয়ায় আরও আসা দরকার তার মধ্যে আছে : বাল্যবিবাহ; শিশুশ্রম; শিশু পাচার; নানা ধরনের শিশু নির্যাতন; শিশুদের খাদ্যাভাব; খেলার মাঠের অভাব এবং বাসা আর স্কুল ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়ার সুযোগ না থাকা। শিশুদের দিয়ে কাজ করানো উচিত নয়, ন্যায্য নয়। প্রত্যেক শিশুর স্কুলে যেতে পারার অধিকার আছে। অনেক সময় বাবা-মায়ের সামর্থ্য থাকলেও তারা ছেলেমেয়েদের স্কুলে না পাঠিয়ে কাজ করতে পাঠান। অনেক সময় অভিভাবকেরা শিশুদের নির্যাতন করেন। অনেক পরিবারে এখনো মেয়েশিশুদের প্রতি বৈষম্য করা হয়; তাদের লেখাপড়া করার সুযোগ দেওয়া হয় না। অনেক বাবা-মা এখনো মনে করেন যে, যতই লেখাপড়া করুক শেষ পর্যন্ত ঘরসংসার করাই মেয়েদের ভাগ্য ও কর্তব্য। মিডিয়ার উচিত, এসব বিষয় গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা এবং এগুলো চ্যালেঞ্জ করা।

— বিভিন্ন বিষয়ের রিপোর্টে শিশুদের মতামতও যুক্ত করা উচিত।

— অনেক সময় রিপোর্টে যা থাকে তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। কিছু জানা ঘটনার রিপোর্টে তথ্যের গরমিল পাওয়া গেছে।

— রিপোর্টে মারামারি-সহিংসতার কথা, বিশেষ করে ছবিতে, ভীতিকর। একবার দেখলে অনেক দিন পর্যন্ত মন থেকে তা যায় না। বিশেষভাবে মর্মান্তিক আর অসহনীয় হচ্ছে গ্রেনেড হামলার মতো ঘটনার ছবি। পত্রিকার প্রথম পাতায় যদি ভয়াবহ, নৃশংস রক্তারক্তির ছবি থাকে তবে পাতা উল্টে ভেতরে প্রিয় কমিক/কার্টুন পড়তেও মন চায় না। 'ক্রাইম ওয়াচ' বা 'ক্রাইম ডায়েরি'র মতো টিভির অনুষ্ঠান দেখলে উদ্বেগ হয়।

— বড়রা শিশুদের দিয়ে মাদক বিক্রি বা অন্যান্য অপরাধ করায়। এসব কাজের দায়িত্ব অবশ্যই ওই সব বড় মানুষদের। কিন্তু মিডিয়ার রিপোর্ট পেছনের সেসব কথা (ব্যাকগ্রাউন্ড) বা পরিস্থিতি তুলে ধরে না। রিপোর্টে বরং শিশুটিকেই দোষী দেখানো হয়। এমনকি নেশা করার জন্যও কোনো শিশুকে একা দায়ী করা যায় না।

— মিডিয়া রিপোর্ট অনেককিছু ঢালাওভাবে বলে। এসব রিপোর্টে অনেক সময় শিশুদের পুরো একটা দলকে অপরাধী বলা হয়। বস্তিতে থাকা একটি শিশু খারাপ কোনো কাজ করতে পারে। কিন্তু তার জন্য বস্তিবাসী সবাই সন্ত্রাসী বা অপরাধী—এমন ধারণা দেওয়া যায় না। বড় দালানে থাকা মানুষেরাও খারাপ হতে পারে।

— শিশুদের এ দলটি সিআরসি অনুযায়ী শিশু হিসেবে অধিকার দাবি করে। তবে তারা বলছে, এজন্য তাদের নিতান্ত শিশু ও অগুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা চলবে না। তারা নিজেদের কিশোর-কিশোরী বলতে পছন্দ করে।

অধ্যায় ৬

দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সিদ্ধান্ত

চলুন, কয়েকটি পরিস্থিতি কল্পনা করা যাক।

> এইচআইভি/এইড্স নিয়ে কাজ করা একটি এনজিওতে আপনার এক বন্ধু চাকরি করেন। তিনি আপনাকে বললেন, তাঁরা কিশোরী যৌনকর্মী হেনার রক্ত পরীক্ষা করে এইচআইভি সংক্রমণ পেয়েছেন। সে এখন তাঁদের হেফাজতে আছে। বন্ধু আপনাকে বললেন যে, হেনা প্রেমিকের প্রতারণায় যৌনকর্মী হয়েছে। সে ঘটনা খুবই মর্মস্পর্শী। বন্ধু বললেন, তার সঙ্গে কথা বলতে পারবেন, তবে আপনার পরিচয় গোপন রেখে এনজিও-কর্মী হিসেবে কথা বলতে হবে। তার ছবিও পাওয়া যাবে। বন্ধু আরও বললেন যে, মেয়েটির সংক্রমণ খারাপ পর্যায়ে। তার অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল প্রয়োজন। কিন্তু সেটা পাওয়ার মতো টাকা তার নেই। রেট্রোভাইরালের দাম এবং এমন অর্থসংকট আরও অনেকের জন্য বড় সমস্যা।

আপনার জন্য প্রশ্ন :

✓ আপনি পরিচয় গোপন রেখে কথা বলবেন? আপনার সিদ্ধান্তের যুক্তি কী হবে?

✓ আপনি রিপোর্ট করবেন? করলে কীভাবে করবেন? কোন বিষয়ে ফোকাস করবেন? কী তথ্য দেবেন বা দেবেন না? আপনার সিদ্ধান্তের যুক্তি কী হবে?

- প্রথম কথা, যত জরুরি রিপোর্টই হোক না কেন, আপনি মেয়েটিকে ধোঁকা দিয়ে পরিচয় ভাঁড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে পারেন না। সে না চাইলে তার জীবনের এই কঠিন অভিজ্ঞতা নিয়ে আপনি রিপোর্ট করতে পারেন না। বিনা সম্মতিতে তাকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে সম্পূর্ণ অনধিকার চর্চা এবং অনৈতিক।

- এ রিপোর্ট কেন করবেন, করা প্রয়োজন কি না, সেটা ভাবুন। হেনা কীভাবে যৌনকর্মী হয়েছে, সেটা মর্মস্পর্শী গল্প। কিন্তু এ রিপোর্ট করার যুক্তি সেটা হতে পারে না। রিপোর্টটি করার সবচেয়ে বড় যুক্তি হচ্ছে এইচআইভি/এইড্স নিয়ে বাঁচা মানুষদের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল পাওয়ার সমস্যার দিকে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং সেটা মেটানোর জন্য কী করা যেতে পারে সেদিকটি খতিয়ে দেখা। এ সমস্যার সমাধান জনস্বাস্থ্যের জন্যও জরুরি বিষয়। সুতরাং এ বিষয়ে রিপোর্ট করা জরুরি।

- এটাই হবে এ রিপোর্টের মূল বিষয়বস্তু—মূল থিম। হেনার সম্মতি সাপেক্ষে তার পরিস্থিতি দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরলে আপনাকে মনোযোগ দিতে হবে এই সংক্রান্ত তার দুর্গতির দিকে। সে কীভাবে যৌনকর্মী হয়েছে সে প্রসঙ্গ অবান্তর হবে। বরং সে যে যৌনকর্মী, এটা উল্লেখ করলে একটি বড় ঝুঁকি হচ্ছে, মনে হতে পারে কেবল এ পেশার মানুষেরাই এইচআইভি সংক্রমিত হচ্ছেন। সুতরাং অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল সমস্যার উদাহরণ দিতে হলে আপনাকে নানা অবস্থানের একাধিক ভুক্তভোগীর কথা বলতে হবে।

- আপনি বন্ধুকে বলুন, হেনাকে এ কথাগুলো বুঝিয়ে বললে সে সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হয় কি না তা দেখতে। যদি সে রাজি হয়েছে বলে বন্ধু আপনাকে বলেন, তখন কথা বলার সময় আপনি হেনাকে আবার নিজের পরিচয় ও উদ্দেশ্য খুলে বলে তার সম্মতি নেবেন। কথা বলবেন, প্রশ্ন করবেন, তাকে সহজ করে নিয়ে এবং তার মনে আস্থা জুগিয়ে। ব্যক্তিগত প্রশ্ন করবেন না। এমন কোনো প্রশ্ন করবেন না, যা তাকে বিব্রত করে, ব্যথিত করে, উদ্বিগ্ন করে। কোনো বিষয়ে তার অস্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ করলে আর প্রশ্ন করবেন না। তার প্রতি মমতাবান হবেন, কিন্তু করুণা করবেন না।

- ভুক্তভোগী আরও মানুষজন কথা বলতে রাজি হয় কি না, সেটাও একইভাবে খোঁজ করুন। এভাবে একাধিক ভুক্তভোগীর সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হলে আপনি হেনার এবং তাদের অভিজ্ঞতার উদাহরণ রিপোর্টে দিতে পারবেন।

- কিন্তু তাদের নাম এবং কোনো রকম শনাক্তকরণযোগ্য তথ্য/ছবি রিপোর্টে দেবেন না। প্রাপ্তবয়স্ক কেউ বুঝেশুনে সম্মতি দিলে এবং তার কোনো ঝুঁকি নেই বুঝলে তাকে শনাক্ত করার কথা আপনি ভাবতে পারেন। শিশু-কিশোর কাউকে কোনোভাবেই শনাক্ত করবেন না। এ গোপনীয়তা কেন দরকার সেটা আপনাকে বুঝতে হবে। নাম-পরিচয় প্রকাশ পেলে সমাজে তাদের কঠিন কলঙ্কের ঝুঁকি আছে। এমনকি নিরাপত্তার ঝুঁকিও থাকে। তাদের ব্যক্তিগত জীবনের তথ্য উল্লেখ করবেন না।

- যদি কোনো ভুক্তভোগীই সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলতে রাজি না হয়, তখন আপনি রিপোর্টটি করবেন এদের নিয়ে কাজ করা মানুষজন, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে কথা বলে। এঁরা কেউ কোনো বিশেষ ভুক্তভোগী সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করলে সেটা ব্যবহার করতে আপনি সতর্ক থাকবেন।

> ১০ বছরের তাহরিমা হোসেন ছোটবেলায় পোলিও আক্রান্ত হওয়ার ফলে হাঁটতে পারে না। সে হুইলচেয়ারে চলে। স্কুলে যায়, ক্লাসে প্রথম হয়। একটি আন্তর্জাতিক ছবি আঁকা প্রতিযোগিতাতেও সে প্রথম হয়েছে।

আপনার জন্য প্রশ্ন :

✓ এই খবরটি করতে গিয়ে আপনি কি বলবেন যে সে হুইলচেয়ারে চলে? নাকি তার মেধার কথা বলবেন? দুটি বিষয়ই আনতে চাইলে কোনটিকে গুরুত্ব দেবেন?

✓ হুইলচেয়ারে চলার বিষয়টি জানানো প্রসঙ্গে আপনি কি তার অনুমতি নেবেন? সে বারণ করলে সেটা মেনে নেবেন?

- রিপোর্টের বিষয়ের অত্যাবশ্যক অঙ্গ না হলে কারও প্রতিবন্ধকতা উল্লেখ করা অবান্তর। সেটা বৈষম্যমূলক হয়ে যায়। তাহরিমার প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখের একটি জোরালো যুক্তি আছে—তার উদাহরণ অন্য প্রতিবন্ধী শিশুদের অনুপ্রেরণা জোগাতে পারে।

- কিন্তু তার সম্মতি ছাড়া আপনি এটা উল্লেখ করতে পারবেন না। তার বয়স খুব কম। তার অভিভাবকের সম্মতি অত্যাবশ্যক হবে।

- এ ছাড়া আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে, রিপোর্টে যেন তার প্রতিবন্ধকতা মূল বিষয় হয়ে না যায়। এ রিপোর্টের প্রত্যক্ষ মূল বিষয়বস্তু তার অর্জন—তার পুরস্কারপ্রাপ্তি। তার প্রতিবন্ধকতার কথা উল্লেখের সম্মতি পেলে আপনি তার প্রতিকূলতা জয়ের দিকটিকে গুরুত্ব দিতে পারবেন। কিন্তু তখনো গুরুত্ব পাবে, রিপোর্টের দৃষ্টিকোণ থাকবে, তার অর্জনের দিকগুলো।

- রিপোর্টটি লিখবেন মমতার সঙ্গে কিন্তু খুবই সতর্ক থাকবেন, যেন তাকে করুণা করা বা বাহবা দেওয়ার মতো পিঠ-চাপড়ানোর সুর রিপোর্টে চলে না আসে। তেমন সুর তাহরিমার প্রতি অন্যায্য হবে। পিঠ-চাপড়ানো কারও কাছেই গ্রহণযোগ্য হয় না।

> বিল্লাল ও শামিম একটি কাচের কারখানায় কাজ করে। তাদের বয়স বারোর নিচে। তাদের বাসায় বসে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আপনি জানলেন, ওই কারখানায় আরও ১০-১১ জন শিশু শ্রমিক আছে। তারা কাচ গলানোসহ নানা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে। দিনে ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। মালিক রহিম চাকলাদার গালাগাল-মারধর করেন। একবার পিটিয়ে বিল্লালের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলেন। তার কপালে সেলাইয়ের দাগ স্পষ্ট। ওরা বলে, তার পরও এ কাজ না করে তাদের উপায় নেই। দুজনেরই বাবা নেই, মায়েরা বাসাবাড়িতে কাজ করেন। ওরা আরও বলে, ওই এলাকায় এমন আরও বেশকিছু কারখানা আছে।

আপনার জন্য প্রশ্ন :

✓ আপনি বিষয়টি কীভাবে রিপোর্ট করবেন? সরেজমিন কারখানায় ঢুকতে চেষ্টা করবেন? ছবি নেবেন? বিল্লাল/শামিমের ছবি ছাপাবেন? তাদের অনুমতি কীভাবে নেবেন? আপনার সিদ্ধান্তের যুক্তি কী হবে?

- প্রথম কথা, এ বিষয়ে রিপোর্ট করা জরুরি কিন্তু এর ফলে বিল্লাল ও শামিমের বিপদ ও ক্ষতি হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি অনেক বড়। সুতরাং আপনাকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে।

- এ রিপোর্ট আপনাকে সময় নিয়ে ঘোরাঘুরি করে করতে হবে। ওই এলাকার অন্য কারখানাগুলোর পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর করবেন। আরও অনেক শিশুশ্রমিকের সঙ্গে কথা বলবেন। তবে গোপনে, তাদের কাজের জায়গা থেকে দূরে।

- তাদের এবং তাদের অভিভাবকদের সম্মতি লাগবে। আপনার পরিচয় দিয়ে রিপোর্টের উদ্দেশ্য ও ধরন বুঝিয়ে বলতে হবে।

- রিপোর্টে এদের কারও নাম-পরিচয় দেওয়ার প্রশ্ন আসে না। বিড়ালের কপালের কাটা দাগটির কথা মনে রাখুন। এদের সব রকম ঝুঁকি আপনাকেই ভাবতে হবে।

- কোনো কারখানায় ঢোকার চেষ্টা আপনি করবেন সবশেষে। মালিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় কোনো শিশুর প্রতি ইঙ্গিত করবেন না। এমন কোনো কথা বলবেন না, যাতে মনে হয়, আপনাকে ওই কারখানার শিশুশ্রমিকেরা তথ্য দিয়েছে। কারখানায় ঢুকতে পারলে বা বাইরে থেকে গোপনে ছবি নেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন, তবে ছবিতে কোনো শিশুকে যেন শনাক্ত না করা যায়।

- কারখানাগুলোয় যেসব ধরনের কাজ হয়, সেগুলো সরকারের অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকায় আছে কি না খোঁজ করুন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জবাবদিহি নিশ্চিত করুন। তাদের দুর্বলতার দিকগুলো তুলে ধরুন।

- রিপোর্ট করার পর ওই শিশুদের পরিস্থিতির ওপর নজর রাখুন। আপনার ফোন নম্বর দিয়ে আসবেন। বিপদ হলে ফোন করতে বলবেন। নিজে গিয়ে খোঁজ নেবেন।

- এ ক্ষেত্রে একটি বড় জটিলতা হচ্ছে ওই শিশুদের আয়-রোজগার করার বাধ্যবাধকতা। এদের মধ্যে যাদের একেবারে নাচার পরিস্থিতি, তাদের কাজের প্রয়োজনীয়তা একটি নিষ্ঠুর বাস্তবতা। আপনি চেষ্টা করবেন তাদের জন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা করা যায় কি না। তাদের স্কুলে যাওয়া ও হালকা কাজ—দুটিই জরুরি, এটা মনে রাখবেন। রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন; এ প্রয়োজনটিকে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরবেন। রিপোর্টের বাইরেও এদের জীবন একটু সহনীয় করার জন্য উদ্যোগী হওয়া হবে আপনার নৈতিকতার দাবি। আপনি কিন্তু বিভিন্ন সংস্থার মনোযোগ টানতে পারেন, সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারেন।

✓ পরিশিষ্ট ২-এ এমন আরও কিছু সম্ভাব্য দ্বিধাদ্বন্দ্বের পরিস্থিতির তালিকা পাবেন। সেগুলো দেখুন এবং সিদ্ধান্ত ও তার যুক্তি ভাবুন।

দ্বিধাদ্বন্দ্ব নৈতিকতার অনুষঙ্গী

নীতি-নৈতিকতা চলমান বিবেচনা দাবি করে। প্রতিটি ঘটনায় করণীয় খুঁটিয়ে ভাবতে হবে। ওপরে আলোচিত কাল্পনিক পরিস্থিতিগুলোয় যেসব প্রশ্ন সামনে এসেছে, নীতি-নৈতিকতার বিবেচনা থেকে সাংবাদিককে অহরহ এমন নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বের মোকাবিলা করতে হয়। চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা বলেছিলাম, সংবাদে যখন শিশু জড়িত থাকে অথবা শিশু গ্রাহকের কোনো ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তখন এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের মীমাংসায় সাবধানতার প্রয়োজনীয়তা অনেক বড় হয়ে আসে।

দ্বিধাদ্বন্দ্ব আসবেই! দ্বিধা হওয়াটা বাঞ্ছনীয়। কেননা তা হলেই রিপোর্টার শিশুর জন্য নৈতিক সাংবাদিকতা করতে সজাগ থাকবেন। দ্বিধা যাঁর হবে না, তিনি বেখেয়ালে শিশুর জন্য হানিকর কোনো কাজ করে ফেলতে পারেন।

শিশুর প্রেক্ষাপটে সংবাদসংক্রান্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিবেচনা ও পরামর্শ মনে রাখুন :

— **মানুষের জানার অধিকার**—কঠিন দ্বিধাদ্বন্দ্ব আসে জনস্বার্থে মানুষের জানার অধিকারের প্রশ্নে। সাংবাদিকতার নীতিমালা বলে, শিশুর ক্ষতি না করা অগ্রাধিকার পাবে।

✓ যুক্তরাজ্যের সাংবাদিকদের সংগঠন এনইউজের আচরণবিধি বলছে, 'যেসব ঘটনায় শিশু জড়িত আছে, সেখানে শিশুর স্বার্থের যে স্বভাবত সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার, সেটা লঙ্ঘন করতে হলে সাংবাদিকদের চরম (এক্সেপশনাল) জনস্বার্থের যুক্তি দেখাতে হবে।'

✓ আপনার লক্ষ্য হবে, শিশুকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে সত্য প্রকাশ করা—ইউনিসেফের একটি প্রকাশনা যেমনটা বলছে, 'শিশুর অধিকারকে আপস না করিয়ে জনকল্যাণে কাজ করা।' (ইউনিসেফ সিইই/সিআইএস, ২০০৭)

▪ শিশুর প্রতি ন্যায্যতা, তার ও তার স্বার্থের সুরক্ষা প্রায় সব সময় সবার ওপরে থাকবে। খুবই বিরল ক্ষেত্রে কোনো শিশুর ঝুঁকি অনিবার্য হলে (যদি একদিকে শিশুর স্বার্থ, অন্যদিকে হাজার মানুষের জীবন রক্ষার স্বার্থ উপস্থিত হয়) তার সুরক্ষার সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নিন।

— **শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ**—সাংবাদিকতার নৈতিকতা বলে, শিশু জড়িত আছে, এমন যেকোনো বিষয়ে ওই শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে সংবাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

✓ তার সর্বোত্তম স্বার্থ সম্পর্কে ওই শিশুর মতামত নিতে হবে এবং তার বয়স, বুঝবিবেচনার পরিণতি ও দায়িত্ববোধ অনুসারে সেই মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে।

✓ শিশুর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠজন, অভিভাবক/শুভানুধ্যায়ীর মতামত নিতে হবে, সেটাকে গুরুত্ব দিতে হবে। তবে বুঝসম্পন্ন শিশু তাঁদের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করলে সেটা আমলে নেবেন, আলোচনা করবেন।

— **কণ্টকাকীর্ণ ক্ষেত্র**—ঘটনার যথাযথ সত্য তথ্য তুলে ধরা ও জড়িত পক্ষগুলোর প্রতি ন্যায্যতা, ব্যক্তিগত জীবযাপনে নিভৃতি ও অন্যান্য সুরক্ষার প্রশ্ন, মৃত্যুসংক্রান্ত সংবাদ, যৌন নিপীড়ন ও যৌনতা-সংশ্লিষ্ট বিষয়, সহিংসতা ও অন্যান্য অপরাধ, বৈষম্যের প্রেক্ষাপট—এসব প্রসঙ্গে সচরাচর দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে।

— **পরামর্শ করুন**—কঠিন দ্বিধাদ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে একা সিদ্ধান্ত না নিয়ে সম্পাদকীয় কর্তৃপক্ষ এবং অভিজ্ঞ সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন। পেশায় যাঁর প্রতি আস্থা আছে তাঁর সঙ্গে আলাপ করা ভালো। এভাবে যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত/সমাধান মিলতে পারে।

— **সিদ্ধান্তের যুক্তি**—সংবাদের প্রকৃত বিষয়বস্তু কোনটি এবং কেন কী করছি সেটা বুঝতে হবে। সংবাদসংক্রান্ত সব সিদ্ধান্তের কারণ ও যুক্তি ভাবুন; ফলাফল ও তাৎপর্য ভাবুন। কী লাভ হবে, কী ক্ষতি হবে? কোনটি বেশি ন্যায্য? সিদ্ধান্তের যুক্তি নিজের কাছে পরিষ্কার না থাকলে ভুল করার ভয় থাকে।

— **দায়বদ্ধতা, জবাবদিহি**—দায়বদ্ধ থাকুন, জবাবদিহি করুন। কাজ করতে গেলে অনিচ্ছা বা সতর্কতা সত্ত্বেও ভুল হয়ে যেতে পারে। ভুল বা বিচ্যুতি যতটুকুই হোক না কেন, সেটা স্বীকার করে সংশোধনের এবং প্রতিকারের চেষ্টা করাও কিন্তু নৈতিকতারই দাবি।

— **প্রতিযোগিতা ও বাণিজ্যিক স্বার্থ**—কখনো আপনি বা আপনার প্রতিষ্ঠান তাৎক্ষণিক বাণিজ্যিক লাভের কথা ভেবে নীতিবিরুদ্ধ চটকদার প্রকাশনার কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পারেন/পারে। বিশেষ করে, অন্য সংবাদমাধ্যমগুলো যদি তেমনটা করে তখন একটা বাজারি চাপ আসে। মনে রাখা এবং মনে করিয়ে দেওয়া ভালো যে, নীতি-নৈতিকতা মান্য করা সাংবাদিকতাই কিন্তু শেষবিচারে দীর্ঘ মেয়াদে পাঠকের সমর্থন ধরে রাখার মতো সুনাম অর্জন করে।

- এখানে শিশুর প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছে, কিন্তু বিবেচনার ভিত্তিগুলো এবং করণীয়র পরামর্শ যেকোনো দ্বিধাদ্বন্দ্বের ক্ষেত্রেই এক আদলের হবে।

অধ্যায় ৭

নীতিমালা ও দায়বদ্ধতার খোঁজে

এ অধ্যায়টি আসলে লিখবেন আপনি। আপনি নিজে আপনার জন্য একটি আচরণবিধি তৈরি করবেন, জবাবদিহি ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার উপায় ঠিক করবেন। আমাদের কাজ শুধু কিছু বিষয়ে আপনার মনোযোগ চাওয়া।

একটি দুষ্টকথা প্রচলিত আছে যে, ভালো সাংবাদিকেরা নীতিমালার অপেক্ষা করেন না এবং খারাপ সাংবাদিকেরা এর তোয়াক্কা করেন না; সুতরাং নীতিমালা তৈরি করা হচ্ছে অযথা সময় নষ্ট করা। **কিন্তু আমরা বলব :** দায়িত্ব ও করণীয়গুলো নিরন্তর নিজেকে মনে করিয়ে দেওয়ার দরকার আছে। সে কারণেই পথপ্রদর্শক আচরণবিধি বা নৈতিকতার বিধিমালা থাকা জরুরি হয়।

তবে আমাদের লক্ষ্য থাকবে এমন সাংবাদিক হওয়া, যাঁর নীতিমালা দেখা প্রয়োজন হবে না, যিনি স্বভাবতই নীতি-নৈতিকতার পথে চলবেন।

নীতিমালা : বাংলাদেশ পরিস্থিতি

সমীক্ষা বলছে, বাংলাদেশে সাংবাদিকতার বিধিবদ্ধ নীতিমালা বা এর চর্চা বিরল। (এমআরডিআই/ইউনিসেফ, ২০০৯)

- ✓ সাংবাদিকদের যেসব ইউনিয়ন বা সংস্থা-সংগঠন রয়েছে, আচরণবিধি নিয়ে সেগুলোর কোনো তৎপরতা চোখে পড়ে না।
- ✓ রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিভিশন ও রেডিওর জন্য নিয়ন্ত্রণবিধি আছে, যেটাকে ঠিক পেশাগত নীতি-নৈতিকতার দিকনির্দেশনা বলা যাবে না। বিটিভির এ বিধিতে শিশু বিষয়ে আলাদা করে তেমন কিছু বলা নেই।
- ✓ সমীক্ষার আওতায় দেখা দেশের মূলধারার ১৪টি ব্যক্তিমালিকানাধীন সংবাদমাধ্যমের মাত্র একটির (দৈনিক পত্রিকা প্রথম আলো) বিধিবদ্ধ পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা হাতে পাওয়া যায়। সেটায় মূলত সাংবাদিকতা করতে গিয়ে কী কী করা যাবে না, তা বলা হয়েছে। ভিকটিমের সুরক্ষা প্রসঙ্গে সেখানে নারীবিষয়ক আলাদা একটি অংশে শিশুর কথা কিছুটা এসেছে, কিন্তু আলাদা করে নয়।

প্রেস কাউন্সিল :

প্রেস কাউন্সিলের বিষয়টি আলাদা গুরুত্ব দিয়ে বলা দরকার। সংবিধিবদ্ধ এ প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের নাগরিকদের সাংবাদিকতা-সংক্রান্ত অভিযোগগুলো মীমাংসার দায়িত্বপ্রাপ্ত। প্রেস

কাউন্সিল আইনটির ঘোষিত লক্ষ্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও মান সংরক্ষণ/উন্নয়ন করা। *(দেখুন অধ্যায় ৫, খ. অংশ)*

— **আচরণবিধি :** সংবাদপত্র, সংবাদ এজেন্সি ও সাংবাদিকদের জন্য বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল একটি আচরণবিধি করে ১৯৯৩ সালে, তা ২০০২ সালে সংশোধিত হয়।

✓ এর ২৫টি বিধি কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের সুরে জারি করা। এগুলোর কোনোটিই শিশুদের ওপরে আলোকপাত করেনি। এর মধ্যে দুটি শিশুর জন্য প্রাসঙ্গিক হতে পারে :

- বিধি ১৩ বলছে, অশ্লীল, অবমাননাকর, বীভৎস সংবাদ বা চিত্র প্রকাশ করা যাবে না।
- বিধি ২৩ বলছে, সমাজের নৈতিক মূল্যবোধের জন্য হানিকর কোনো কিছু ঘটলে তা তুলে ধরতে হবে। তবে নারী/পুরুষের সম্পর্ক বা নারীসংক্রান্ত যেকোনো সংবাদ বা চিত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে কঠোর সতর্কতা চাই।

✓ এ আচরণবিধির পরিশিষ্টে সাংবাদিক ও প্রকাশকের জন্য দুটি শপথনামা সংযুক্ত আছে। ২৪ নম্বর বিধিটি বলছে, সাংবাদিকেরা চাকরি নেওয়ার সময় সম্পাদকের সামনে প্রথম শপথনামা পাঠ করে সই করতে বাধ্য থাকবেন। শেষ বিধিটি বলছে, প্রকাশক দ্বিতীয় শপথনামাটি পড়ে সই করতে আইনত বাধ্য থাকবেন। নিয়ন্ত্রণের সুর সাংবাদিকদের সঙ্গে খাটে না।

— **কার্যত গুরুত্বহীন :** কেউ এ প্রতিষ্ঠান বা তার আচরণবিধির খোঁজ রাখেন বলে মনে হয় না। প্রতিষ্ঠানটি খোঁজ রাখার মতো ভূমিকা নেয় বলেও মনে হয় না।

✓ প্রেস কাউন্সিলের ২০০৭ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় নভেম্বর ২০০৮-এ।

✓ এক বছর পর সমীক্ষার গবেষকদল যোগাযোগ করলে এই প্রতিবেদনটিই দেওয়া হয়। এতে এই আচরণবিধি আছে।

✓ দেখা যায়, ২০০৭ সালে কমিশন সাকল্যে ১৫টি মামলার শুনানি করেছে এবং জনমানুষের কাছ থেকে মাত্র ১০টি অভিযোগ পেয়েছে।

আপনার জন্য কিছু করণীয়

— আপনি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন, সেখানে সহকর্মীদের মধ্যে আচরণবিধির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা তুলুন। সম্পাদকীয় কর্তৃপক্ষের কাছে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করুন।

— আপনি সাংবাদিকদের কোনো ইউনিয়ন/সমিতি/সংগঠন/সংস্থা/প্রেসক্লাবে যুক্ত থাকলে সেটার সংবিধান দেখুন। কোনো ধরনের আচরণবিধি আছে কি না খোঁজ করুন। তেমন কিছু না থাকলে এটা করার প্রস্তাব দিন। আচরণবিধি বিষয়ে সাংবাদিকদের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নিন।

— নিজের জন্য একটি আচরণবিধি তৈরি করুন। কয়েকজন সমমনা সাংবাদিক/সহকর্মী মিলে

এ কাজটি করা ভালো হবে। সার্বিক আচরণবিধি এবং শিশুর জন্য বিশেষ নীতিমালা দুটোই করবেন। কেননা, সার্বিকভাবে নীতি-নৈতিকতা না মানলে শিশুর জন্য নৈতিক সাংবাদিকতা করা সম্ভব নয়। এ বইয়ের অধ্যায় ৩ ও ৪ থেকে সাধারণ দিকনির্দেশনা পাবেন। অধ্যায় ৫-এ উত্থাপিত বাংলাদেশে শিশুর জন্য নৈতিক সাংবাদিকতার জরুরি প্রসঙ্গগুলোও মাথায় রাখবেন।

✓ সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের জন্য করতে গেলে বিশদ বিধিমালা বেশি কাজে লাগতে পারে।

✓ নিজের জন্য করলে মূল বিষয়গুলো সংক্ষেপে নিয়ে আসতে পারেন।

✓ **মূল বিবেচনার সার্বিক ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে থাকবে**—সত্য খোঁজা ও তুলে ধরা; সমাজের সব অংশের প্রতি মনোযোগ এবং পক্ষপাতশূন্যতা; বৈষম্যহীনতা; দুর্বলের প্রতি বিশেষ মনোযোগ; জনস্বার্থ সংরক্ষণ এবং ব্যক্তির প্রতি দায়িত্ব—ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনযাপনের অধিকার; সংবাদ সংগ্রহে সততা-স্বচ্ছতা; সংবাদে জড়িত মানুষজনের প্রতি ন্যায্যতা ও সততা, তাদের সম্মতি নিশ্চিত করা; সংবাদে জড়িতজনের প্রতি সংবেদনশীলতা; সুরুচি ও শালীনতা, সংবাদের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সতর্কতা; অপরাধ-সহিংসতার খবর ও ছবি বিষয়ে সতর্কতা; পেশাগত সততা ও স্বতন্ত্র অবস্থান/স্বার্থের দ্বন্দ্ব; জবাবদিহি ও দায়বদ্ধতা।

- কাঠামোর ধারণা পেতে পরিশিষ্ট ৪-এ তথ্যসূত্রে দেওয়া ওয়েবঠিকানায় গিয়ে এসপিজে, এনইউজে এবং আইএফজের আচরণবিধি/নীতিমালা দেখে নিতে পারেন।

✓ **শিশুর জন্য মূল বিবেচনাগুলোর মধ্যে থাকবে**—খবর বাড়ানো ও ভালোভাবে খবর করা; শিশুর মতামত-বক্তব্যের প্রতিফলন; শিশুকে উপস্থাপন/চরিত্রচিত্রণ; শিশুর সুরক্ষা; সংবেদনশীলতা ও দায়িত্ব; শিশুর সাক্ষাৎকারের নীতিমালা; নাজুক অবস্থানের শিশুদের প্রতি বিশেষ দায়িত্ব; শিশুকে ব্যবহার করে খবরের কাটতি না বাড়ানো; শিশুর শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশের ওপর সংবাদের নেতিবাচক প্রভাবের ঝুঁকি; দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা।

- পরিশিষ্ট ৩-এ শিশুবিষয়ক রিপোর্টিংয়ের জন্য ইউনিসেফের দিকনির্দেশনা দেখুন; পরিশিষ্ট ৪-এ তথ্যসূত্রে আইএফজের শিশুবিষয়ক রিপোর্টিংয়ের দিকনির্দেশনার লিংক পাবেন।

শেষ কথা

নীতিমালা বা আচরণবিধি সাংবাদিককে নিজের তাগিদ থেকে তৈরি করতে হবে। সেটা মানতে হবে নিজের আগ্রহে, স্বেচ্ছায়। কোনো নীতিমালাই কিন্তু নৈতিক সাংবাদিকতা নিশ্চিত করতে পারবে না। সেটা করতে পারে একমাত্র সাংবাদিকের নিজস্ব নৈতিকতাবোধ, সেই বোধের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ আনুগত্য—দায়বদ্ধতা।

সাংবাদিকদের মধ্যে এককভাবে নিজের কাজ এবং পেশার সার্বিক ভূমিকা নিয়ে আত্মসমালোচনার চর্চা খুব দরকার। নিজের কাজের ফলাফল বিচার করার অভ্যাস করুন। ফলাফলের দায়িত্ব নিন। প্রশ্নটি আপনার জবাবদিহির।

মনে রাখুন, শিশুর প্রতি দায়িত্বশীল থাকা, শিশুর কাছে জবাবদিহি বজায় রাখার অর্থ—ভবিষ্যতের প্রতি কর্তব্য মেটানো।

অধ্যায় ৮

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১

তালিকা : শিশু বিষয়ে সম্ভাব্য প্রতিবেদনের ক্ষেত্র

(এমআরডিআই/ইউনিসেফ, ২০০৯ সমীক্ষায় বাংলাদেশে শিশুবিষয়ক রিপোর্টের ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে এ তালিকা ব্যবহৃত হয়)

ক. নির্যাতন ও শোষণ/নিপীড়ন

১. যৌন নির্যাতন/হয়রানি

২. নিকটাত্মীয়ের হাতে যৌন নির্যাতন

৩. পাচার

৪. অপহরণ

৫. শারীরিক নির্যাতন/হয়রানি

৬. মানসিক নির্যাতন/হয়রানি

৭. স্কুলে শিক্ষকের হাতে শারীরিক নির্যাতন

৮. অ্যাসিড-সন্ত্রাস

৯. হত্যা

১০. আত্মহত্যা

খ. ঝুঁকিপূর্ণ বা নাজুক অবস্থান

১. ঝুঁকিপূর্ণ জীবন—পথশিশু

২. ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম—পেশাদার যৌনকর্মী

৩. ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম—গৃহকর্মী

৪. ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম—অন্যান্য

৫. শিশুশ্রম

৬. বাল্যবিবাহ/কিশোরী-মাতৃত্ব

৭. প্রতিবন্ধী

৮. অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠী : যেমন : আদিবাসী, দলিত, বেদে, যৌনকর্মীর সন্তান

৯. দুর্ঘটনায় মৃত্যু

১০. দুর্ঘটনা

১১. নিখোঁজ

গ. আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু

১. মাদকাসক্তি ও মাদক বেচাকেনা

২. সহিংসতা ও অন্যান্য ফৌজদারি 'অপরাধ'

৩. পুলিশের সংস্পর্শ/পুলিশি হেফাজত/নিরাপত্তা হেফাজত/বিচার

৪. আশ্রয়কেন্দ্র/সংশোধনীর স্থান

ঘ. শিশু অধিকার

১. উদ্ধার ও পুনর্বাসন

২. শিক্ষা

৩. পুষ্টি—মা ও শিশু

৪. স্বাস্থ্যসেবা

৫. স্বাস্থ্যজনিত কারণে মৃত্যু

৬. এইচআইভি/এইড্স/যৌনরোগ

৭. প্রজননস্বাস্থ্য

৮. জন্মনিবন্ধন

৯. বিনোদন/খেলাধুলা/সংস্কৃতি

১০. মতপ্রকাশের স্বাধীনতা

১১. আইন সহায়তা বা আইনগত বিষয়

১২. শিশুসংগঠন/সংঘ

১৩. জীবনসংগ্রাম

১৪. জীবনযাপন

ঙ. শিশু ও সরকার/রাষ্ট্র

১. শিশুসংক্রান্ত সরকারি নীতি/পদক্ষেপ/পরিকল্পনা

২. সরকার বা রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিদের শিশুসংক্রান্ত ঘোষণা

৩. শিশুদের জন্য সরকারি বরাদ্দ/অপচয় ও অপব্যবহার

৪. শিশুদের জন্য সরকারের বিশেষ প্রতিষ্ঠান

চ. বিজয়/উত্তরণ/অর্জন

১. সৃজনশীলতা

২. উদ্ভাবন

৩. সামাজিক অবদান

৪. মেধা

৫. অন্যান্য ইতিবাচকতা

পরিশিষ্ট ২

নৈতিকতার প্রশ্নে দ্বিধাদ্বন্দ্বের কিছু ক্ষেত্র

পরিস্থিতিগুলো কল্পিত। কিন্তু এই আদলের দ্বিধাদ্বন্দ্বে রিপোর্টারকে বিভিন্ন সময়ে পড়তে হতে পারে। আপনার প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে এর সঙ্গে যোগ করতে পারেন। এগুলো নিয়ে ভাবার চর্চা দ্বিধাদ্বন্দ্বের ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে যেমন রিপোর্টারকে সচেতন করবে, তেমনি চটজলদি সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।

১

আট বছরের সোহাগ বাবা আবদুর রশিদের হাতে মা কামরুন্নাহারকে খুন হতে দেখেছে। তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তা আপনাকে তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে দেবেন বললেন।

- ✓ কথা বলতে চাইবেন? আপনি কি এ কথা বন্ধু সাংবাদিকদের বলবেন? সঙ্গে কেউ যেতে চাইলে নেবেন? না নিলে কেন নেবেন না?
- ✓ আপনি কথা বলতে গেলেন। সে কথা বলতে চায় কি না, এটা কি আগে নিশ্চিত হবেন—তার অনুমতি নেবেন? দেখছেন যে, সে খুবই হতবিহ্বল। আপনি প্রশ্ন করলে সে গুছিয়ে কিছু বলতে পারছে না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চললে কিছুটা উত্তর মিলছে। আপনি কী করবেন? আপনার সিদ্ধান্তের যুক্তি কী হবে?

২

র‌্যাবের 'ক্রসফায়ার'-এ এলাকার কুখ্যাত সন্ত্রাসী 'সাইড-অফ বাবুল' মারা গেছেন। একদা বোমা বানাতে গিয়ে বিস্ফোরণে তাঁর একদিকের গালের মাংস উড়ে যাওয়ায় তিনি এ নামটি পেয়েছিলেন। সাংবাদিকেরা তাঁর লাশের গুলিবিদ্ধ ছবি তোলার সুযোগ পেয়েছেন। খোঁজ নিয়ে জানলেন, সব পত্রিকাই এ ছবি বড় করে ছাপবে।

- ✓ আপনার পত্রিকার কী করা উচিত? সিদ্ধান্তের যুক্তি কী হবে?

৩

ঢাকা হেডকোয়ার্টার্সে বিডিআর বিদ্রোহের কয়েক দিন পর সেখানকার এক বড় সেনা কর্মকর্তা কর্নেল জলিল আহমেদ ও তাঁর স্ত্রী আশেকা আহমেদের লাশ কবর থেকে তোলা হয়েছে। তাঁদের বাড়িতে গিয়ে আপনি শোবার ঘরের মেঝেতে রক্তের দাগ দেখলেন। বিছানার পাশে ছিন্নবিচ্ছিন্ন একটি সালোয়ার ও কামিজ পড়ে ছিল। আপনি এসবের ছবি তুলেছেন। এই দম্পতির দুটি শিশুসন্তান আছে, তারা ঘটনার দিন বাইরে স্কুলে ছিল। এখন এক আত্মীয়ের বাড়িতে আছে।

- ✓ আপনি কি ওই বাড়ির চিত্র বিষয়ে রিপোর্ট করবেন? কীভাবে করবেন? কী ছবি ছাপবেন? কী বিবেচনা করবেন? কোথায় সতর্ক হওয়া দরকার বলে মনে করেন?

৪

লঞ্চডুবি হয়েছে। চার দিন পর উদ্ধারকারীরা একটি শিশুর গলিত দেহ উদ্ধার করেছেন। উদ্ধারকারী ডুবুরি যখন সে দেহ টেনে তুলে ডাঙায় এসে দাঁড়ান, তার হাতের একটি চুড়ি দেখে তার মা ছুটে এসে আহাজারি করছিলেন। পুরো দৃশ্যটি আপনি ক্যামেরাবন্দি করলেন। মায়ের আহাজারির আলাদা ছবিও নিলেন।

✓ ছবি নেওয়ার আগে কি অনুমতি নেবেন? ছবি কি ছাপাবেন? কোনটি? আপনার সিদ্ধান্তের যুক্তি কী? অন্য লাশের ছবি ছাপবেন? রিপোর্টটি কীভাবে লিখবেন?

৫

পনেরো বছরের পারুল আক্তার গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। স্কুলে যাওয়ার পথে তাকে তুলে নিয়ে যায় রফিক, গোলাম, আলম ও শফিক—প্রতিবেশী এই চার যুবক। মেয়েটি বলছে, একটি বাড়িতে আটকে রেখে তারা তাকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করে। সংলগ্ন একটি পাটক্ষেত থেকে মেয়েটিকে উলঙ্গ অবস্থায় উদ্ধার করে এলাকার মানুষজন। অভিযুক্তরা পলাতক। এলাকায় যে একটিমাত্র বেসরকারি উচ্চবিদ্যালয় আছে, মেয়েটি সেখানে নবম শ্রেণীতে পড়ত। গত বার্ষিক পরীক্ষায় সে প্রথম হয়েছিল। তার ছোট বোনও একই স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে। তার বাবা শফিকুল ইসলাম স্থানীয় বাজারে একটি মুদি দোকানের মালিক। রসুলপুর গ্রামের মোড়লপাড়ার উত্তর পাশে তাদের বাড়ি। তার মা একজন গৃহবধূ। তারা চার ভাইবোন। মেয়েটি দেখতে খুবই সুন্দরী, বাড়ন্ত গড়নের। প্রতিবেশী কেউ কেউ গোপনে আপনাকে বলেছেন, মেয়েটি প্রায়ই বাজারে-পথেঘাটে ছেলেদের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলত। মেয়েটি নিজে থানায় গিয়ে মামলা দায়ের করেছে। সে আপনার সঙ্গে কথা বলেছে।

✓ সে রাজি হলে কি তার সঙ্গে কথা বলা বা তার দেওয়া তথ্য প্রকাশ জায়েজ হবে? এ ঘটনাটি আপনি কীভাবে রিপোর্ট করবেন? কী খোঁজ করবেন, কার বক্তব্য নেবেন? ওপরের কোন কোন তথ্য ব্যবহার করবেন? সিদ্ধান্তগুলোর যুক্তি কী হবে?

৬

মোমেনা খাতুনের বয়স ১০ বছর। তার বাবা আবদুর রহিম হারুন এন্টারপ্রাইজ নামের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করেন। তিনি নিজের মেয়েকে নিয়মিত ধর্ষণ করেন। উন্মোচন নামের একটি বেসরকারি সংস্থার গবেষণায় এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে। আরও অনেকের এমন নির্যাতনের কথা জানা গেছে। সংস্থাটি এক সংবাদ সম্মেলনে ভিকটিমদের নাম-পরিচয় গোপন রেখে তথ্যগুলো জানিয়েছে। কিন্তু আপনি সংস্থায় নিজস্ব একটি সূত্রে খোঁজখবর করে বেশ কয়েকটি মেয়ে ও ছেলের প্রকৃত নাম ও বিস্তারিত পরিচিতি জেনেছেন। এ ছাড়া ওই সংস্থার কাছ থেকে আপনি আরও অনেক কেস স্টাডি পেয়েছেন। সংস্থার মানুষজন এ ধরনের পরিস্থিতি থেকে শিশুর সুরক্ষার জন্য তাঁরা যেসব কাজ করেন সেসব তথ্যও দিয়েছেন।

✓ আপনি কী রিপোর্ট করবেন? কার কতটা তথ্য কীভাবে তুলে ধরবেন? রিপোর্টে কোন দিকে বেশি গুরুত্ব দেবেন?

৭

সুপরিচিত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আবদুল হালিমের বিরুদ্ধে তাঁর রোগিণী সুস্মিতা হালদার চিকিৎসাকালীন যৌন নিপীড়নের অভিযোগে মামলা করেছেন। খোঁজখবরে আরও এমন কয়েকটি অভিযোগ জানতে পারলেন। জনাব হালিম অভিযোগগুলো অস্বীকার করেছেন। এদিকে ব্যক্তিগত জীবনে জনাব হালিম তিন বার বিয়ে করেছেন। তাঁর প্রাক্তন স্ত্রীরা তাঁর সম্পর্কে অনেক অভিযোগ করছেন। তিন স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সাতটি সন্তান আছে। এদের মধ্যে মৌমিতা, শিল্পী, অরুণ ও তরুণ বয়সে শিশু ও কিশোর।

✓ জনাব হালিমের পারিবারিক তথ্য কতখানি কীভাবে প্রতিবেদনে আনবেন? এ রিপোর্ট করলে জনাব হালিমের শিশুসন্তানেরা আহত হতে পারে। এ রিপোর্ট লেখার সময় তাঁর শিশুসন্তানদের ওপরে এর প্রভাব কি মনে রাখা দরকার? যুক্তিগুলো ভাবুন।

৮

ভারতের কলকাতার সোনাগাছি যৌনপল্লী থেকে যশোরের শার্শা উপজেলার ডিহি ইউনিয়নের শিববাস গ্রামের আরিফা, মোমেনা ও শরিফা—এ তিন কিশোরীকে উদ্ধার করার পর দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

✓ আপনি এদের ছবি পেয়েছেন; নাম, বাবার নাম এবং আনুষঙ্গিক তথ্য পেয়েছেন। রিপোর্ট করবেন? কীভাবে? ছবি ছাপাবেন? আপনার সিদ্ধান্তের যুক্তি কী?

আরেক ঘটনায় তিনটি ১০/১১ বছরের মেয়ে—নাবিলা, কামিনী ও রশিদা উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ এবং দেশে ফিরিয়ে আনার সঙ্গে যুক্ত একটি এনজিও বলছে, এরা দিল্লির একটি চুড়ি কারখানায় দাসত্ব করছিল। এদের বাবা-মায়ের খোঁজ মেলেনি।

✓ এদের ছবি ও বিস্তারিত বিবরণ ছাপাবেন? আপনার সিদ্ধান্তের যুক্তি কী হবে?

৯

দৌলতদিয়া যৌনপল্লীর যৌনকর্মীদের মেয়েসন্তানেরা কাছেই কেকেএস এনজিওর একটি নিরাপদ আবাসে থেকে লেখাপড়া করছে। হাসনাহেনা, শাবানা, সুমি, আবেদাসহ কয়েকজনের সঙ্গে আপনি কথা বললেন। তারা তাদের স্বপ্নের কথা জানাল। আপনি তাদের দৈনন্দিন কিছু কাজের এবং ক্লাসে লেখাপড়া করার ছবি তুলেছেন।

✓ তারা কি ছবি তুলতে দিতে বা কথা বলতে রাজি হয়েছে বা আপনি কি তাদের সম্মতি

চেয়েছেন? আপনি রিপোর্টের কথা তাদের কী বলবেন? ছবি ছাপাবেন? তাদের নাম ব্যবহার করবেন? তাদের মায়েদের প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করবেন?

১০

শহরের মাস্টারপাড়ার স্কুলছাত্রী কিশোরী নুরুননাহার অ্যাসিড-আক্রান্ত হয়েছে। আক্রমণের কারণটি করুণ। পাড়ার এক যুবকের প্রেম প্রত্যাখ্যান। দীর্ঘ ইতিহাস। মা-বোন কাঁদতে কাঁদতে বলছে। ছবি তুলেছেন, বীভৎস ছবি। এদিকে আপনি দেখছেন, চিকিৎসার সুযোগ তেমন নেই। ডাক্তার বলছেন নানা সমস্যার কথা।

✓ রিপোর্টে কী গুরুত্ব পাবে? কীভাবে বিষয়টি কভার করবেন? কথা বলার বা ছবি তোলার অনুমতি কীভাবে নেবেন—রিপোর্ট সম্পর্কে কি তাদের জানাবেন? ছবি ছাপবেন? কেমন ছবি?

১১

ইন্টারনেটে বাংলাদেশি পর্নোগ্রাফির কয়েকটি ওয়েবসাইট নিয়ে পুলিশ অনুসন্ধান চালাচ্ছে। এসব ওয়েবসাইটে ১২/১৪ বছরের বিভিন্ন মেয়েকে ব্যবহার করা হচ্ছে। আপনি নিজে বিষয়টি যাচাই করেছেন। এবং কিছু ইনডিসেন্ট ছবি নামিয়েছেন। এতে ওই মেয়েদের মুখ ঝাপসা, হার্ডকোর পর্নো ছবিও এগুলো না। কিন্তু তাদের ছবির আভাসে, ভঙ্গিতে বিষয়টি বোঝা যায়।

✓ আপনি কি রিপোর্টে ওয়েবসাইটের নাম দেবেন? প্রমাণ হিসেবে ওই ছবি ছাপাবেন? আপনার সিদ্ধান্তের যুক্তি কী হবে?

১২

টোকাইদের বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ার ওপরে প্রতিবেদন করছেন। অনেকদিন ধরে সরেজমিন ঘুরে, অনেকের সঙ্গে কথা বলে রিপোর্ট করছেন। টোকাইদের কেউ চুরির কথা বলছে, কেউ স্থানীয় সন্ত্রাসীদের হয়ে অস্ত্র বহন করার কথা বলছে। কেউ জানাচ্ছে হরতালের সময় পিকেটিংয়ে অংশ নেওয়ার কথা। পুলিশ আবুল, মনির ও রসুল নামের তিনজনের ছবি নিয়ে জানাচ্ছে, এরা ভাড়াটে খুনি। এরা এখন আটক আছে। মাত্র কয়েক শ টাকার বদলে অনেকগুলো খুন করার কথা এরা স্বীকার করেছে। পুলিশের বয়ান অনুসারে এরা মারাত্মক খুনে।

✓ টোকাইদের সঙ্গে কথা বলার আগে নিজেকে কীভাবে পরিচিত করবেন, নাকি পরিচয় লুকোনো ভালো হবে? কেন কথা বলছেন সে সম্পর্কে কী জানাবেন? কোন তথ্য কীভাবে রিপোর্ট করবেন? কার ছবি ছাপাবেন বা ছাপাবেন না? এদের সম্পর্কে বাস্তবতার কোন দিক তুলে ধরবেন? এদের কী হিসেবে/কীভাবে উপস্থাপন করবেন? 'টোকাই' শব্দটি লিখবেন? কাদের নাম-পরিচয় গোপন রাখবেন এবং কেন? কাদের সম্পর্কে পুলিশকে আপনার পাওয়া তথ্য জানাবেন এবং কেন?

১৩

গোয়েন্দা সংস্থার কাছ থেকে শহরে ইয়াবা ব্যবসার ওপরে একটা প্রতিবেদন পেয়েছেন। তাতে অনেক বিশদ তথ্য আছে। যেমন : কোথায় কোথায় এটা মিলছে; কারা এটার উপাদান আমদানি করে; কী পদ্ধতিতে কেমন দামের কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে কারা এটা তৈরি করে; কারা বিক্রি করে; কীভাবে নেশাকারীরা এটা সংগ্রহ করে। কোথায় কোথায় এটা সেবনকারীদের আড্ডা বসে।

✓ প্রতিবেদন করবেন? কীভাবে করবেন? কেন কী সিদ্ধান্ত নেবেন?

১৪

বারো বছরের নিলয় মোস্তফার বাবা-মা দুজনেই চাকরি করেন। নিলয় স্কুল থেকে এসে একা একা বাড়িতে থাকে। পাড়ার দুজন বয়সে একটু বড় ১৪/১৫ বছরের কিশোর আনু ও সলিমের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। এরা তিনজন দুপুরে কাজের বুয়া চলে গেলে বাড়িতে বসে ভিসিপিতে পর্নো ছবি দেখত। একদিন বাবা-মা বাড়ি ফিরে দেখেন নিলয়ের গলা কাটা লাশ ঘরে পড়ে আছে, ভিসিপি নেই। আনুকে পুলিশ ধরতে পেরেছে। সে বলেছে, ভিসিপি ও নিলয়ের দামি একটি ক্যামেরার লোভে তারা দুজন এই খুন করেছে। ঘটনাটি বেশ কয়েকদিন ধরে রিপোর্ট করছেন। ব্যাপক আলোচিত বিষয়। একসময় কথা হতে থাকে যে, নিলয়ের বাবা-মার দায়িত্বে ঘাটতি ছিল। ঘটনার দায় তাঁদের ওপরেও বর্তায়।

✓ আপনি পুরো বিষয়টি কীভাবে রিপোর্ট করবেন? আনু ও সেলিম সম্পর্কে কী লিখবেন এবং কী লিখবেন না? তাদের নাম পরিচয় দেবেন? আপনার সিদ্ধান্তের যুক্তি কী হবে? নিলয়ের বাবা-মায়ের দায়িত্ব সম্পর্কে কিছু লিখবেন/তাঁদের প্রশ্ন করবেন? সিদ্ধান্তের যুক্তি কী হবে।

১৫

দিনমজুরের ছেলে রফিউল হোসেন এসএসসিতে গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়েছে। পরিবারটি হতদরিদ্র। ছেলেটি খুব কষ্ট করে লেখাপড়া করেছে। সে ভবিষ্যতে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু এখন টাকার অভাবে তার কলেজে ভর্তি হওয়া না-ও হতে পারে।

✓ এ বিষয়ে আপনি কীভাবে প্রতিবেদন করবেন? কী ফুটিয়ে তুলবেন? কোন কোন বিষয়ে সতর্ক থাকবেন?

১৬

ভাই ছোটন দশ বছর বয়সী, বোন আঞ্জুম পাঁচ বছরের। উঠানে দা নিয়ে খেলছিল। খেলতে খেলতে ভাইয়ের দায়ের আঘাতে বোন মারা গেছে। শোকার্ত বাবা-মা ছেলেকে দুষছেন।

পাড়াপ্রতিবেশীরা বললেন, ছেলেটি খুব নিষ্ঠুর। তাঁরা ছোটনের সহিংস আচরণের নানা ঘটনা আপনাকে জানালেন।

✓ এ ঘটনাটিকে আপনি কীভাবে উপস্থাপন করবেন? বোনের মৃত্যুকে কী হিসেবে বর্ণনা করবেন?

১৭

ইংরেজি মাধ্যমের সানরাইজ স্কুলটি ব্যয়বহুল ও নামীদামি। সমাজের অনেক সুপরিচিত বড় বড় মানুষজনের ছেলেমেয়েরা সে স্কুলে পড়ে। আপনি অষ্টম শ্রেণীর আসিফ চৌধুরীর কাছ থেকে জেনেছেন, স্কুলটিতে অনেক ছাত্রছাত্রী ইয়াবাসহ অন্যান্য মাদকে আসক্ত। ওপরের ক্লাসের হাসানুর রহমান, আবীর মোস্তফা, রফিকুল বারীসহ আরও কয়েকজন স্কুলেই এসব মাদক বিক্রি করে। প্রধান শিক্ষিকা রেহানা পারভীনের সঙ্গে কথা বললে তিনি সত্যতা স্বীকার করলেন; বললেন, তাঁরা নানা রকম ব্যবস্থা নিচ্ছেন। তিনি অনুরোধ করলেন এ নিয়ে প্রতিবেদন না করতে।

✓ আপনি প্রতিবেদন করবেন? করলে কি আরও খোঁজখবর করবেন? কী খুঁজবেন? কাকে কীভাবে পরিচিত করবেন?

পরিশিষ্ট ৩

UNICEF Guidelines for Reporting on Children

Reporting on children and young people has its special challenges. In some instances the act of reporting on children places them or other children at risk of retribution or stigmatization.

UNICEF has developed these principles to assist journalists as they report on issues affecting children. They are offered as guidelines that UNICEF believes will help media to cover children in an age-appropriate and sensitive manner. The guidelines are meant to support the best intentions of ethical reporters: serving the public interest without compromising the rights of children.

A. Principles

1. The dignity and rights of every child are to be respected in every circumstance.

2. In interviewing and reporting on children, special attention is needed to ensure each child's right to privacy and confidentiality, to have their opinions heard, to participate in decisions affecting them and to be protected from harm and retribution, including the potential of harm and retribution.

3. The best interests of each child are to be protected over any other consideration, including over advocacy for children's issues and the promotion of child rights.

4. When trying to determine the best interests of a child, the child's right to have their views taken into account are to be given due weight in accordance with their age and maturity.

5. Those closest to the child's situation and best able to assess it are to be consulted about the political, social and cultural ramifications of any reportage.

6. Do not publish a story or an image which might put the child, siblings or peers at risk even when identities are changed, obscured or not used.

B. Guidelines for interviewing children

1. Do no harm to any child; avoid questions, attitudes or comments that are judgmental, insensitive to cultural values, that place a child in danger or expose a child to humiliation, or that reactivate a child's pain and grief from traumatic events.

2. Do not discriminate in choosing children to interview because of sex, race, age, religion, status, educational background or physical abilities.

3. No staging: Do not ask children to tell a story or take an action that is not part of their own history.

4. Ensure that the child or guardian knows they are talking with a reporter. Explain the purpose of the interview and its intended use.

5. Obtain permission from the child and his or her guardian for all interviews, videotaping and, when possible, for documentary photographs. When possible and appropriate, this permission should be in writing. Permission must be obtained in circumstances that ensure that the child and guardian are not coerced in any way and that they understand that they are part of a story that might be disseminated locally and globally. This is usually only ensured if the permission is obtained in the child's language and if the decision is made in consultation with an adult the child trusts.

6. Pay attention to where and how the child is interviewed. Limit the number of interviewers and photographers. Try to make certain that children are comfortable and able to tell their story without outside pressure, including from the interviewer. In film, video and radio interviews, consider what the choice of visual or audio background might imply about the child and her or his life and story. Ensure that the child would not be endangered or adversely affected by showing their home, community or general whereabouts.

C. Guidelines for reporting on children

1. Do not further stigmatize any child; avoid categorisations or descriptions that expose a child to negative reprisals - including additional physical or psychological harm, or to lifelong abuse, discrimination or rejection by their local communities.

2. Always provide an accurate context for the child's story or image.

3. Always change the name and obscure the visual identity of any child who is identified as:

a. A victim of sexual abuse or exploitation,

b. A perpetrator of physical or sexual abuse,

c. HIV positive, or living with AIDS, unless the child, a parent or a guardian gives fully informed consent,

d. Charged or convicted of a crime,

e. A child combatant, or former child combatant who is holding a weapon or weapons.

4. In certain circumstances of risk or potential risk of harm or retribution, change the name and obscure the visual identity of any child who is identified as:

a. A former child combatant who is not holding a weapon but may be at risk,

b. An asylum seeker, a refugee or an internal displaced person.

5. In certain cases, using a child's identity - their name and/or recognizable image - is in the child's best interests. However, when the child's identity is used, they must still be protected against harm and supported through any stigmatization or reprisals.

Some examples of these special cases are:

a. When a child initiates contact with the reporter, wanting to exercise their right to freedom of expression and their right to have their opinion heard.

b. When a child is part of a sustained programme of activism or social mobilization and wants to be so identified.

c. When a child is engaged in a psychosocial programme and claiming their name and identity is part of their healthy development.

6. Confirm the accuracy of what the child has to say, either with other children or an adult, preferably with both.

When in doubt about whether a child is at risk, report on the general situation for children rather than on an individual child, no matter how newsworthy the story.

পরিশিষ্ট ৪

তথ্যসূত্র ও ওয়েবঠিকানা

১. সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা; সার্বিক ও শিশুবিষয়ক

— ***Melvin Mencher's News Reporting and Writing, 11th Edition***; Mencher, Melvin; McGraw-Hill, New York, USA; 2008

— ***Children's Rights and Journalism Practice—A Rights-based Perspective***; Syllabus commissioned by UNICEF Regional Office for Central and Eastern Europe and Commonwealth of Independent States (CEE/CIS); UNICEF–Dublin Institute of Technology; 2007

পাবেন : http://elearning-events.dit.ie/unicef/html/unit2/2_4_4.htm **এখানে শিশু অধিকার ও সাংবাদিকতার করণীয় সম্পর্কে তথ্য ও পরামর্শ পাবেন। নীতি-নৈতিকতার প্রসঙ্গও পাবেন।**

— ***Child Rights and the Media/Putting Children in the Right***; Guidelines for journalists and media professionals; International Federation of Journalists; IFJ—Brussels, Belgium, 2002

e-mail : ifj@ifj.org/ website: www.ifj.org; ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব জার্নালিস্টসের ওয়েবসাইট। এদের শিশু বিষয়ে আলাদা নীতিমালা আছে।

— **www.nuj.org.uk;** যুক্তরাজ্য ও আয়ারল্যান্ডের সাংবাদিক ইউনিয়নের এ ওয়েবক্ষেত্রে তাঁদের আচরণবিধি পাবেন।

— **www.spj.org;** যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিকদের সংগঠনের এ ওয়েবক্ষেত্রে তাঁদের আচরণবিধি পাবেন।

— **www.pcc.org.uk;** যুক্তরাজ্যের প্রেস কমপ্লেইন্টস কমিশনের এ ওয়েবক্ষেত্রে দেশটির সংবাদপত্র ও সাময়িকীর জন্য অনুসরণীয় বিধিমালা পাবেন।

— **www.bbc.co.uk/guidelines;** বিবিসির সম্পাদকীয় নীতিমালা/নির্দেশনা। যখন যেটা প্রয়োজন, বিষয় ধরে দেখতে পারেন।

— **www.poynter.org-Poynter;** পয়েন্টার ইনস্টিটিউট যুক্তরাষ্ট্রের একটি সাংবাদিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। এদের নিজস্ব নীতিমালা আছে। এ ছাড়া, নীতিমালার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা পাবেন এদের একাধিক ব্লগে।

- **http://www.rjionline.org/mas/codes-of-ethics.php;** যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডোনাল্ড ডব্লিউ রেনল্ডস জার্নালিজম ইনস্টিটিউটের এই ওয়েবঠিকানায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আচরণবিধি ও নৈতিকতার বিধিমালা পাবেন।

- ***Bangladesh Press Council/Annual Report 2007***—Dhaka, November 2008; এখানে প্রেস কাউন্সিলের প্রণীত আচরণবিধিটি পাবেন।

- **http://presscouncil.nic.in/norms.htm;** এখানে ভারতের প্রেস কাউন্সিলের আচরণবিধি পাবেন।

- **www.crin.org;** ইয়োরোপভিত্তিক এনজিওদের শিশু অধিকার মোর্চার কিছু নির্দেশনা পাবেন তাদের ওয়েবক্ষেত্রে।

২. বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় শিশু

- **Baselaine Study: Children in Bangladesh News Media;** তাহমিনা ও অন্যান্য, শিশু ও বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম বিষয়ে ভিত্তি-সমীক্ষা, এমআরডিআই/ইউনিসেফ, ২০০৯ (অপ্রকাশিত)। এ সমীক্ষায় বাংলাদেশের অগ্রণী ১২টি দৈনিক পত্রিকা ও তিনটি টিভি চ্যানেলের শিশুবিষয়ক সংবাদ (জুন–আগস্ট ২০০৯) বিশ্লেষণ করা হয়। এ ছাড়া, দেশজুড়ে কর্মরত রিপোর্টার ও সংবাদপ্রবাহের নীতিনির্ধারক বা গেটকিপারদের নিয়ে প্রশ্নপত্র জরিপ করা হয়। গেটকিপার ও শিশুদের সঙ্গে দুটি দলগত আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়।

- **প্রশিক্ষণ সহায়িকা/নীতি-নৈতিকতা মেনে শিশুদের জন্য সাংবাদিকতা;** এমআরডিআই/ইউনিসেফ, ২০১০; (অপ্রকাশিত)।

৩. জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ

- **http://www.unicef.org/crc/index_30225**

- **http://www.unicef.org/crc/index_30229.html.html**

- **http://www.unicef.org/crc/index_30160.html**

- **http://www.unicef.org/rightsite/; 20 YEARS OF UNCRC**

- **http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en;** বিভিন্ন দেশের সনদ স্বাক্ষর ও অনুমোদনের তথ্য

— শিশু অধিকার/জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ; আইন ও সালিশ কেন্দ্র/রাইটস ক্লাস্টার, ইউনিসেফ; ১৯৯৮ এবং জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ; সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও ইউনিসেফ; (প্রকাশনার কোনো সাল দেওয়া নেই) এ দুটি পুস্তিকায় সহজ বাংলায় পুরোটা সনদ পাবেন।

— **http://www.unicef.org/bangladesh/knowledgecentre_6251.htm;** এখানে বাংলাদেশ সরকারের সর্বশেষ সনদ বাস্তবায়ন পরিস্থিতির প্রতিবেদন (তৃতীয় ও চতুর্থ কিস্তি) পাবেন। নাম : 'Third and Fourth Periodic Report of the Government of Bangladesh under the CRC (August, 2007)'

— **http://www.unicef.org/bangladesh/knowledgecentre_5809.htm;** এখানে বাংলাদেশ সরকারের সনদ বাস্তবায়ন পরিস্থিতির তৃতীয় ও চতুর্থ কিস্তির প্রতিবেদন সম্পর্কে সিআরসি কমিটির পর্যবেক্ষণ-সংবলিত প্রতিবেদনটি পাবেন। নাম : 'Concluding observations of the CRC Committee to Bangladesh June 2009.'

— **http://www.unicef.org/magic/resources/resources_for_journalists.htm;** ইউনিসেফের ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় অনেক বিষয় ও লিংক পাবেন।

৪. বাংলাদেশের আইন

— *শিশু বিষয়ক আইন*; মো. আনছার আলী খান; বাংলাদেশ ল' বুক কোম্পানি (তৃতীয় সংস্করণ) ২০০৯

— *বাংলাদেশে গণমাধ্যম আইন ও বিধিমালা*; আবু নছর মো. গাজীউল হক সংকলিত; এশিয়ান মিডিয়া ইনফরমেশন অ্যান্ড কম্যুনিকেশন সেন্টার (অ্যামিক); ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড; ১৯৯৬

৫. বিবিধ

— **http://www.unicef.org/bangladesh/knowledgecentre_6012.htm;** ইউনিসেফের এই ওয়েবঠিকানায় নারী ও শিশু পরিস্থিতির ওপর বিভিন্ন তথ্য পাবেন।

— *বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে* ২০০৭; ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পপুলেশন অ্যান্ড রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং—নিপোর্ট, মিত্র অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস এবং ম্যাক্রো ইন্টারন্যাশনাল; ২০০৯; ঢাকা, বাংলাদেশ এবং ক্যালভারটন, মেরিল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র।

— *বাংলাদেশ আদমশুমারি—২০০১, ন্যাশনাল সিরিজ, প্রথম খণ্ড, অ্যানালিটিকাল রিপোর্ট, অক্টোবর*, ২০০৭; বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, বাংলাদেশ।

সত্যনিষ্ঠতা থেকে শুরু করে
যে বিষয়গুলো প্রতিবেদনে নিশ্চিত করা
অত্যাবশ্যক হয়, সেগুলো সাংবাদিকের নৈতিকতারও
অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেই সঙ্গে আসে সংবাদে জড়িত মানুষজন,
সর্বসাধারণ এবং পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের প্রতি দায়িত্বের বিবেচনা।
এভাবে পেশাদারির সঙ্গে বিচার-বিবেচনা, সুরুচি ও বিবেকের দাবি
এবং মানবিকতা ও দায়বদ্ধতার সমন্বয় করে সাংবাদিকতার
নীতি-নৈতিকতা রূপরেখা পায়।

MRDI

unicef